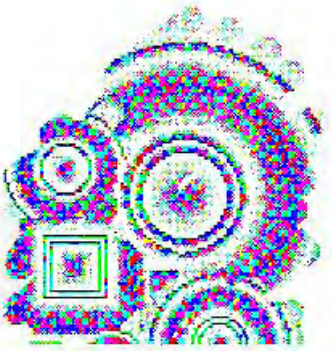

মহাকাশে মহাত্রাস

ক'দিন থেকেই হাসান মনে মনে ছটফট করছে। আজ প্রায় পাঁচ বছর হল সে মহাকাশ স্টেশন এণ্ড্রোমিডার সর্বময় কর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এর ভিতরে পৃথিবীতে গিয়েছে মাত্র কয়েকবার—শেষবার গিয়েছিল এক বছর আগে মাত্র দু'সপ্তাহের জন্যে। পৃথিবীতে তার আপন বলতে কেউ নেই, তাই বোধহয় পৃথিবীটাই তার খুব আপন। ছেলেবেলায় অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছিল, বড় হয়ে মহাকাশ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডক্টরেট করেছে। প্রথম কয়েক বছর শিক্ষানবিস হিসেবে বিভিন্ন মহাকাশ ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছে, তারপর খুব অল্প বয়েসেই তাকে এণ্ড্রোমিডার দায়িত্ব নিতে হয়েছে। মহাকাশে নিঃসঙ্গ পরিবেশে গুটিকতক বিজ্ঞানী নিয়ে রুটিনবাঁধা কাজ করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, এবারে তার ক'দিন বিশ্রাম নেয়া দরকার। পৃথিবীতে ছুটি চেয়ে খবর পাঠিয়েছিল, প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। মঙ্গল গ্রহ থেকে যে-মহাকাশযানটি আকরিক শিলা নিয়ে ফিরে আসছে, সেটি এণ্ড্রোমিডাতে পৌঁছে যাবার পর তার ছুটি। মহাকাশযানটির ক্রুদের সাথে সে পৃথিবীতে ফিরে যাবে, এবারে অন্তত ছয়মাস সে পৃথিবীর মাটি-হাওয়ায় ঘুরে বেড়াবে। মাঝে মাঝে খুব নিঃসঙ্গ মনে হয়—মিষ্টিমতো কোনো মেয়ে পেলে হয়তো বিয়েও করে ফেলতে পারে।

মিষ্টি একটা মেয়ের কথা মনে হতেই তার জেসমিনের কথা মনে হল। এন্ড্রোমিডাতে শিক্ষানবিস হিসেবে সে প্রায় মাসখানেক হল এসেছে আরো দু' জন ছেলের সাথে। মেয়েটি ভারি চমৎকার, একেবারে বাচ্চা—দেখে মনেই হয় না মহাকাশ প্রাণিবিদ্যায় ডক্টরেট করেছে। প্রথমবার মহাকাশে এসেছে, তাই ওকে সব কিছু শিখিয়ে দিতে হচ্ছে। সঙ্গের ছেলে দুটোও খুব চমৎকার। একজন পদার্থবিদ, অন্যজন মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ। পদার্থবিদ ছেলেটির নাম জাহিদ, একটু চুপচাপ, হাসে কম, কথা বলে কম—তবে খুব কাজের। অন্যজনের নাম কামাল, ভীষণ ছটফটে—সব সময় হৈচৈ করে বেড়াচ্ছে, দেখে বোঝাই যায় না যে সে নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকটরের[১] একজন বিশেষজ্ঞ বিশেষ।

এই তিনজন ছেলেমেয়ে এণ্ড্রোমিডাতে আসার পর থেকে এণ্ড্রোমিডার গুমোট দম আটকানো ভাবটা কেটে গেছে। ইদানীং হাসানও আর এতটা নিঃসঙ্গ অনুভব করে না। গত সপ্তাহে সব কয়জন টেকনিশিয়ান আর বিজ্ঞানীরা জরুরি খবর পেয়ে পাশের মহাকাশ ল্যাবরেটরিতে চলে গেছে—এত বড় মহাকাশ স্টেশনে এখন ওরা মাত্র চার-

জন! কিন্তু হাসানের মোটেই খারাপ লাগছে না—ছেলেমেয়ে তিনটিকে নিয়ে বেশ স্ফূর্তিতেই আছে।

জাহিদ, কামাল আর জেসমিন হাসানের নাম পৃথিবী থেকেই শুনেছিল। অসামান্য কৃতিত্বের জন্যে দু'বার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে বয়স ত্রিশ না পেরোতেই, তাই এখানে আসতে পেরে ওরা নিজেদের খুব ভাগ্যবান মনে করছে। হাসানের সাথে পরিচয় হবার কয়দিনের ভিতরেই বুঝতে পেরেছে, এত অল্প বয়সে একজন মানুষ কী জন্যে দু'বার জাতীয় পুরস্কার পায়! হাসানের মতো পরিশ্রমী আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। কামাল হাসানকে দেখে এত মুগ্ধ হয়েছে যে, আচার-আচরণে নিজের অজান্তেই হাসানকে অনুকরণ করার চেষ্টা করছে।

পৃথিবীর হিসেবে আর ছয় দিন পর মঙ্গল গ্রহ থেকে ফেরত আসা মহাকাশযানটি এণ্ড্রোমিডাতে পৌঁছবে। তার ব্যবস্থা করার জন্যে হাসান প্রতি বারো ঘণ্টা অন্তর মহাকাশযানটির সাথে যোগাযোগ করে—প্রয়োজন হলে কম্পিউটারে ছোটখাটো হিসেব করে রাখে। রুটিনবাঁধা কাজ, এখন জাহিদ আর কামাল মিলেই করতে পারে। দু' জনেরই খুব উৎসাহ—কেমন করে মহাকাশ স্টেশনে এসে একটি রকেট আশ্রয় নেয়—ব্যাপারটি দেখার ওদের খুব কৌতূহল।

সারা দিন ঝামেলার পর হাসান ঘুমানোর জন্যে তার কেবিনে যাচ্ছিল। যাওয়ার সময় যোগাযোগ-কক্ষটা ঘুরে যাওয়ার জন্যে লিফটটাকে ছয়তলায় থামিয়ে ফেলল। ঝকঝকে উজ্জ্বল করিডোর ধরে হেঁটে যোগাযোগ-ঘরে পৌঁছে সে জাহিদ, কামাল আর জেসমিনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পায়—কী নিয়ে জানি তুমুল তর্ক হচ্ছে। হাসান ঘরে ঢুকে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, এত হৈচৈ কিসের?

স্যার—কামাল হড়বড় করে বলতে থাকে—বারটা চৌত্রিশ মিনিটে যোগাযোগ করার কথা ছিল, বারটা সাঁইত্রিশ হয়ে গেছে, এখনও ওরা কথা বলছে না—

কারা?

মঙ্গল গ্রহ থেকে যারা ফিরে আসছে—

হাসানের ভুরু কুঁচকে গেল, এমনটি হবার কথা নয়। বলল, যন্ত্রপাতি ঠিক আছে তো?

জ্বি স্যার।

দেখি—

হাসান মহাকাশযানটির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল, কিন্তু হেডফোনে এক বিস্ময়কর নীরবতা ছাড়া এতটুকু শব্দ শোনা গেল না।

জাহিদ কাছে দাঁড়িয়েছিল, জিজ্ঞেস করল, স্যার, এমন কি হতে পারে, যে, ওদের ট্রান্সমিটার নষ্ট হয়ে গেছে?

হতে পারে, কিন্তু সব সময়েই ডুপ্লিকেট রাখা হয়। এ ছাড়াও ইমার্জেন্সি কিট থাকে—ওরা যদি যোগাযোগ নাও করতে চায়, আমরা ইচ্ছে করলে ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারব।

সেটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখবেন একটু?

দেখলাম। কোনো সাড়া নেই।

স্যার—জেসমিন এগিয়ে এসে ভীত চোখে বলল, তাহলে কী হয়েছে ওদের?

মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল হাসানের,বলল, কী হয়েছে আন্দাজ করে আর লাভ কি, বের করে ফেলি।

সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য স্বয়ংক্রিয় রাডার[২] স্টেশন বসানো রয়েছে। মহাকাশযানটির কাছাকাছি কয়েকটা রাডার স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করে হাসান ছবি নেবে ঠিক করল। সুইচ প্যানেলে ঝুঁকে কাজ করতে করতে একসময় অনুভব করল, জাহিদ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসান জিজ্ঞেস করল, কিছু বলবে?

জ্বি স্যার।

কি?

আমার মনে হয় মহাকাশযানটি কোনো নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশানে ধ্বংস হয়েছে।

হাসান চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, একথা বলছ কেন?

ঘন্টাখানেক আগে মহাকাশের তেজস্ক্রিয়তা হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। হিসেব করে দেখেছি মহাকাশযানটি যতদূরে রয়েছে সেখানে কোনো ছোট পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটলে এটুকু হওয়া উচিত।

হাসান বুঝতে পারল, ছেলেটা ঠিকই ধরেছে, কিন্তু এ ব্যাপারে যুক্তি দিয়ে অগ্রসর হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, যখন নিশ্চিত হবার মতো ব্যবস্থা রয়েছে।

ঘন্টাখানেক পরে একগাদা আলোকচিত্র নিয়ে হাসান তার কেবিনে ছটফট করছিল। জাহিদের ধারণা সত্যি। মহাকাশযানটি পারমাণবিক বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আটজন ক্রু নিয়ে এরকম দুর্ঘটনা গত দশ বছরে আর একটিও হয় নি। পৃথিবীতে খবর পাঠানো হয়েছে—কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল ব্যাপারটি দেখার জন্যে একটা ছোট রকেট 'সিগনাস' পাশের মহাকাশ স্টেশন থেকে রওনা হয়ে গেছে।

জাহিদ, কামাল আর জেসমিন খুব মুষড়ে পড়েছে। হাসান ওদের নানাভাবে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কোনো লাভ হয় নি।

বিছানায় শুয়ে হাসান খুব ক্লান্তি অনুভব করে। তার নার্ভ আর সইতে পারছে না। কোনো এক নীল হ্রদের পাশে মাটির কাছাকাছি ঘাসে শুয়ে থেকে থেকে আকাশে সাদা মেঘ দেখার জন্যে ওর বুকটা হা-হা করতে থাকে।

পরদিন ভোরে হাসান খুব আশ্চর্য একটি খবর পেল। খবরটি প্রথমে জানাল জাহিদ। তার নিজস্ব হিসেব অনুযায়ী মহাকাশে তাদের কাছাকাছি নাকি আরও তিনটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে।

সকালের রিপোর্ট পৌঁছুতেই দেখা গেল জাহিদের ধারণা সত্যি। গত বার ঘন্টায় সর্বমোট পাঁচটি মহাকাশযান পারমাণবিক বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়েছে, তার ভিতরে তিনটি তাদের কাছাকাছি, লক্ষ মাইলের ভিতরে। এই পাঁচটি মহাকাশযান ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি দেশের এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিল। পাঁচটি মহাকাশযানে দুই শতাধিক প্রথমশ্রেণীর টেকনিশিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার আর বিজ্ঞানী কাজ করছিল—সবাই মর্মান্তিকভাবে মারা গেছে!

কন্ট্রোলরুমে হাসান চুপচাপ বসে রইল। সে চোখ বন্ধ করে দেখতে পাচ্ছে, সমস্ত পৃথিবীতে কী ভয়ানক আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেছে। খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন কী সাংঘাতিক হৈচৈ শুরু করেছে! কিন্তু এরকম হচ্ছে কেন?

জেসমিন ম্লানমুখে বসে ছিল—অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ধীরে ধীরে বলল,

আমার ভালো লাগছে না—কেন জানি মনে হচ্ছে একটা ভীষণ বিপদ ঘটতে যাচ্ছে।

হাতে মুঠি করে ধরে রাখা কাগজ খুলে কম্পিউটারের ডাটা দেখতে দেখতে জাহিদ বলল, আমার হিসেবে ভুল না হয়ে থাকলে আরো দু'টি মহাকাশযান ধ্বংস হয়েছে।

সত্যতা যাচাই করে নেবার উৎসাহ পর্যন্ত কেউ দেখাল না। বুঝতে পারল, সত্যিই তাই ঘটেছে।

হাসান সব কয়টি চ্যানেল চালু রেখে যতগুলি সম্ভব মহাকাশযানের সাথে যোগাযোগ রেখে চলল। অনেক কয়টা মহাকাশযান পৃথিবীতে নেমে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় দু'টি মহাকাশ ল্যাবরেটরি খালি করে সব কয়জন বিজ্ঞানী আর টেকনিশিয়ান পৃথিবীর দিকে ফিরে গেল। যারা পৃথিবী থেকে দূরে—কিংবা পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারছিল না, তারা ভীষণ অসহায় অনুভব করতে লাগল। কারণ গড়ে প্রতি দুই ঘন্টায় একটা করে মহাকাশ স্টেশন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সবাই ধারণা করে নিয়েছে, একটা অজ্ঞাত কোনো মহাকাশযান একটি একটি করে পৃথিবীর সবকয়টি মহাকাশযান ধ্বংস করে যাচ্ছে। প্রথমে জল্পনাকল্পনা এবং ধারণা, কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার মাথায় দেখা গেল ব্যাপারটা আসলেও তাই।

জাপানের একটি উপগ্রহ ধ্বংস হয়ে যাবার পূর্বমুহূর্তে একজন বিজ্ঞানীকে চিৎকার করে বলতে শোনা গেল—'ফ্লাইং সসার'!

পৃথিবী থেকে সবাইকে মহাকাশযানগুলি খালি করে পৃথিবীতে চলে আসার নির্দেশ দেয়া হল। যারা অনেক দূরে কিংবা যাদের এই মুহূর্তে পৃথিবীতে ফিরে আসা সম্ভব নয়, তাদেরকে বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়ার আদেশ দেয়া হল।

হাসান পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার জন্যে ছোট্ট রকেটটাতে জ্বালানি ভরে নিয়ে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে নিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা পৃথিবীতে রওনা দেবে। সারাদিনের উত্তেজনায় জাহিদ, কামাল আর জেসমিন বিপর্যস্ত। হাসান জোর করে ঘন্টাখানেকের জন্যে বিশ্রাম নিতে পাঠিয়েছে। একেকজন এত ক্লান্ত যে মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে।

হাসান তার মহাকাশ স্টেশনে সব কয়টি রাডার চালু করে রেখেছে, যদিও জানে তাতে কোনো লাভ নেই। এ পর্যন্ত যে কয়টি মহাকাশযান ধ্বংস হয়েছে তাদের ভিতরে কেউ সতর্ক হবার এতটুকু সুযোগ পায় নি, যদিও সবার কাছেই সর্বাধুনিক রাডার ছিল। খুব কাছে আসার পর হয়তো সেটিকে দেখা যায়, কিন্তু ততক্ষণে কিছু করার থাকে না। এণ্ড্রোমিডাতে নূতন ধরনের অনেকগুলি রাডার স্টেশন ছিল, যেগুলি আন্তঃসৌরমণ্ডল যোগাযোগে সাহায্য করার জন্যে আনা হয়েছিল। এণ্ড্রোমিডা ছেড়ে চলে যেতে হবে শোনার পর হাসান এই মূল্যবান ক্ষুদ্রকায় কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষমতাবান রাডার স্টেশনগুলি এণ্ড্রোমিডাকে ঘিরে চারদিকে পাঠিয়ে দিয়েছে। যদি ভাগ্য ভালো হয়, হয়তো তাদের কোনো একটি এই রহস্যময় ফ্লাইং সসারকে দেখতে পেয়ে তাকে সতর্ক করে দিতে পারবে।

পৃথিবীর দিকে রওনা দেবার আর দেরি নেই। জ্বালানি নিয়ে নেয়া হয়েছে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি কাজ করতে শুরু করেছে। আর ঘন্টাখানেক পরেই ইচ্ছে করলে রওনা দেয়া সম্ভব—যদি-না এর মাঝেই সেই ফ্লাইং সসার এসে হানা দেয়।

সব কিছু ঠিক করার পর জাহিদ কামাল আর জেসমিনকে ডেকে তোলার জন্যে নিচে নেমে আসছিল, ঠিক সেই সময় সে সতর্ক সংকেত শুনতে পেল। সংকেত শুনে কেন জানি হঠাৎ ওর বুকের ভিতর রক্ত ছলাৎ করে উঠল।

শান্ত পায়ে কন্ট্রোল-রুমে গিয়ে সে স্ক্রীনের দিকে তাকায়। নীলাভ স্ক্রীনে একটি অশরীরী ছবি। পিরিচের মতো একটা অদ্ভুত মহাকাশযান ঘুরতে ঘুরতে ছুটে আসছে। মিনিট দু'য়েক সে এটিকে দেখতে পেল—রাডার স্টেশনের খুব কাছে দিয়ে ছুটে যাবার সময় স্ক্রীনে ধরা পড়েছে। যদিও এখন আর দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু রাডার স্টেশনের পাঠানো হিসেব দেখে নির্ভুল বলে দেয়া যায়, এই কুৎসিত ফ্লাইং সসারটি ছুটে আসছে এণ্ড্রোমিডার দিকে। গতিবেগ অস্বাভাবিক, এণ্ড্রোমিডার কাছাকাছি পৌঁছুতে আর মাত্র ঘন্টাখানেক সময় নেবে।

হাসান একটা চেয়ারে বসে ঠাণ্ডা মাথায় একটা সিগারেট ধরাল। এখন কী করা যায়?

প্রচণ্ড বিপদের মুখে ঠাণ্ডা মাথায় নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে হাসানের পৃথিবীজোড়া সুনাম রয়েছে। তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার এবং বাস্তবায়নের ক্ষমতা, আর উপস্থিত বুদ্ধির জন্যে সে দু'বার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে অসহায় বোধ করে। যেখানে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত সোভিয়েত ইউনিয়নের উপগ্রহ আর্কাদি গাইদার মুহূর্তের মাঝে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, সেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযুক্ত একটি মহাকাশ স্টেশন কীভাবে টিকে থাকবে। পৃথিবীতে রওনা দিয়ে লাভ কী—তা হলে প্রথমে এণ্ড্রোমিডাকে ধ্বংস করে তারপর তাদের ক্ষুদ্র রকেটটাকে শেষ করে দেবে। হাতে সময় এক ঘন্টা, হাসানের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে চারজন মানুষের জীবন।

মিনিট দশেকের ভিতর সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল—তারপর ছুটে গেল চারতলায়। একটা রুবি ক্রিষ্টাল লেসার[৪] টিউবকে টেনে বের করে নিয়ে এসে বসাল কন্ট্রোল-রুমের জানালার কাছে। তারপর ক্ষিপ্র অভ্যস্ত হাতে কম্পিউটারটি চালু করে দ্রুত কয়েকটা সংখ্যা প্রবেশ করিয়ে দিল, ফ্লাইং সসারের যাত্রাপথ ছকে বের করার জন্যে। লেসার টিউবের কানেকশান দিয়ে নিচে নেমে গিয়ে ডেকে তুলল জাহিদ, কামাল আর জেসমিনকে। ঘড়ি দেখে সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, তোমাদের পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হল পোশাক পরে প্রস্তুত হবার জন্যে। আর ঠিক সাত মিনিট পরে তোমরা রকেটে প্রবেশ করবে—পৃথিবীতে ফিরে যাবার জন্যে।

কামাল কী একটা বলতে যাচ্ছিল, হাসান শীতল চোখে বলল, একটি কথাও নয়। তোমরা প্রস্তুত হয়ে রকেট লাঞ্চারে এস—আমি আসছি। মনে রাখবে ঠিক পাঁচ মিনিটের ভিতর—যদি বাঁচতে চাও।

পাঁচ মিনিটের আগেই ওরা পোশাক পরে রকেটের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হাসান এল সাথে সাথেই, বুকখোলা শার্ট আর চিন্তিত মুখে—বরাবর যেরকম থাকে।

স্যার, আপনি পোশাক পরলেন না?

জেসমিনের কথার উত্তরে হাসান একটু হাসল—বলল, আমার জন্যে এ পোশাকই যথেষ্ট। যাক—সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কাজের কথা বলি। শোন, আমি যখন কথা বলব, কেউ একটি কথাও বলবে না, যা যা বলব অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে। প্রথমত

ঠিক দু' মিনিট পরে তোমরা তিনজন রকেটে উঠে দরজা বন্ধ করবে—

তিনজন মানে? আপনি—

হাসান সরু চোখে কামালের দিকে তাকাল, ঠাণ্ডা গলায় বলল, কথার মাঝখানে কথা বলতে নিষেধ করেছি; মনে আছে? যা বলছিলাম, ঠিক দশ মিনিট পর স্টার্ট নেবে। এক্সেলেরেশান করবে টেন জি বা তারও বেশি। খুব কষ্ট হবে, কিন্তু এ ছাড়া পালানোর কোনো উপায় নেই। পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ রেখো—যে-কোনো রকম ঝামেলা দেখলে ওদের পরামর্শ চাইবে। পৃথিবীর অ্যাটমস্ফিয়ারে ঢোকার সময় খুব সাবধান। ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলটা নিখুঁতভাবে বের করে নেবে—একটুও যেন নড়চড় না হয়। বায়ুমণ্ডলের ভেতরে ঢুকে আধ ঘন্টার ভিতর প্যারাশুট খুলে যাবে। না খুললে ইমার্জেন্সি কিট ব্যবহার করবে। আর শোন, আমার এই চিঠিটা দেবে ডিরেক্টরকে। বুঝেছ?

জ্বি। স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কি?

আপনি আমাদের সাথে যাবেন না?

না।

তা হলে আমরাও যাব না।

হাসানের মুখে খুব সূক্ষ্ম একটা হাসি খেলে গেল। ধীরে ধীরে বলল, এটা সেন্টিমেন্টের ব্যাপার না জাহিদ। আর চল্লিশ মিনিটের ভিতর ফ্লাইং সসার এণ্ড্রোমিডাকে ধ্বংস করবে—ওটা এখন এণ্ড্রোমিডার দিকে ছুটে আসছে। যদি আমরা চারজনই রকেটে পৃথিবীতে রওনা দিই, প্রথমে এন্ড্রোমিডাকে ধ্বংস করে তারপর রকেটটাকে শেষ করবে।

রকেটটা যেন শেষ করতে না পারে, সে জন্যে আমি এণ্ড্রোমিডাতে থাকব। সসারটাকে একটা আঘাত করতে হবে, যেভাবেই হোক। আমি লেসার টিউব বসিয়ে এসেছি। যদিও এটা অস্ত্র হিসেবে কখনো ব্যবহার করা হয় নি, তবু মনে হচ্ছে চমৎকার কাজ করবে। কম্পিউটার থেকে যাত্রাপথ বের করেছি। আমি সসারটার মাঝখান দিয়ে ছয় ইঞ্চি ব্যাসের ফুটো করে ফেলব।

স্যার—

সময় শেষ হয়েছে, যাও, রকেটে ওঠ।

স্যার, জেসমিনের চোখে পানি চিকচিক করে ওঠে।

হাসানের ইচ্ছে হল, কোমল স্বরে দু'-একটা কথা বলে, কিন্তু তা হলে সবাই ভেঙে পড়বে। মুখটাকে কঠোর করে সে আদেশ দিল, তাড়াতাড়ি—

তবু ওরা দাঁড়িয়ে রইল। একজনকে মৃত্যুর মুখে ফেলে দিয়ে ওরা কীভাবে যাবে? হাসান এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ধরে, তারপর কঠোর স্বরে ধমকে উঠল, যাও, ওঠ—

একজন একজন করে ওরা ভিতরে ঢুকল। হাসান দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর আটকে রাখা দীর্ঘশ্বাসটা খুব সাবধানে বের করে দিল।

লিফট বেয়ে ছ'তলায় ওঠার সময় গুমগুম আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল ওদের তিন জনকে নিয়ে রকেটটা পৃথিবীর দিকে রওনা দিয়েছে। পৃথিবী! সবুজ পৃথিবী!

হাসানের চোখে পানি এসে যায়—মাটির পৃথিবী, ঘাসের পৃথিবী, আকাশের পৃথিবী—মানুষের পৃথিবী—এ জীবনে আর দেখা হল না।

তিরিশ মিনিট পর দেখা গেল লেসার টিউব নির্দিষ্ট দিকে তাক করে রেখে হাসান চুপ করে বসে আছে। হাতে সিগারেট, মাথার উপরে ঘড়ি, লাল কাঁটাটা বার'র উপরে আসতেই তাকে সুইচ টিপে প্রচণ্ড শক্তিশালী লেসার বীম পাঠাতে হবে। অদৃশ্য সেই সসারকে ফুটো করে দেবে সেই রশ্মি। তারপর?

তারপর হাসান আর ভাবতে চায় না ফ্লাইং সসারের পান্টা আঘাতে তার কি হবে ভেবে কী লাভ?

একত্রিশ মিনিট পর জাহিদ কাউন্টারগুলি থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে কাঁপা গলায় বলল, আমার হিসেবে ভুল না হয়ে থাকলে এণ্ড্রোমিডা এ মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে গেল।

জাহিদ, কামাল আর জেসমিন এণ্ড্রোমিডা ছেড়ে এসেছে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা আগে। এই চব্বিশ ঘন্টার প্রতিটি মুহূর্ত তারা অবর্ণনীয় আতঙ্কের মাঝে কাটিয়েছে। এর আগে এণ্ড্রোমিডাতে হাসান তাদের সব বিপদে-আপদে আগলে রেখেছিল, কিন্তু এখন এই নিঃসঙ্গ মহাকাশযানে তারা সত্যিকার অসহায়। মানসিকভাবে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মাঝে রয়েছে বলে হাসানের জন্যে দুঃখবোধটাও তেমন যন্ত্রণা দিতে পারছে না।

পৃথিবীতে পৌঁছুতে তাদের আরো আটচল্লিশ ঘন্টারও বেশি সময় লাগবে। যদি এর আগেই ফ্লাইং সসার আক্রমণ করে বসে তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা। কিন্তু ওরা খানিকটা আশাবাদী, কারণ গত চব্বিশ ঘন্টায় আর একটি মহাকাশযানও নূতন করে ধ্বংস হয়নি। বোঝাই যাচ্ছে হাসানের লেসার রশ্মি সত্যি সত্যি ফ্লাইং সসারকে আঘাত করতে পেরেছিল। কিন্তু আঘাতের পর ফ্লাইং সসার নিজেই ধ্বংস হয়ে গেছে, না শুধুমাত্র অল্প কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা এখনো বলা যাচ্ছে না। পৃথিবীর সবাই আশা করছে ফ্লাইং সসার ধ্বংস হয়ে গেছে, যদিও মহাকাশযানে এই নিঃসঙ্গ তিনজন ঠিক ততটা বিশ্বাস করতে পারছে না। জাহিদ প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর সাথে আলাপ করছে, রকেটে করে দূরপাল্লার পাড়ি দেয়ার সময় এর আগে তার কখনো নেতৃত্ব দিতে হয় নি। কামাল সতর্ক দৃষ্টিতে রাডারগুলির দিকে নজর রাখছে। যদিও রাডারে ফ্লাইং সসার ধরা পড়লে তাদের কিছু করার নেই, কিন্তু তবুও সে নিজের চোখে জিনিসটা দেখতে চায়। জেসমিনের আপাতত কিছু করার নেই। মনে মনে খোদাকে ডেকে আর হাসানের কথা ভেবে কষ্ট পেয়ে সে সময় পার করছিল।

পৃথিবীতে মহাকাশের সর্বশেষ খবর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জরুরি বেতার আর টেলিভিশনে করে প্রচারিত হচ্ছিল। হাসানের ফ্লাইং সসারকে পান্টা আঘাত করে আত্মত্যাগ করার খবর পৃথিবীতে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। দেশ থেকে তাকে মরণোত্তর সর্বোচ্চ পদক দিয়ে সম্মান করা হয়েছে। হাসানের সাথে সাথে জাহিদ, কামাল আর জেসমিনের নামও পৃথিবীর সবার জানা হয়ে গেছে। এই তিনজন অনভিজ্ঞ তরুণ-তরুণী কিভাবে সময় কাটাচ্ছে, পৃথিবীতে ফিরে আসতে আর কতক্ষণ সময় বাকি রয়েছে, এইসব খবরাখবর খানিকক্ষণ পরেপরেই নিউজ বুলেটিনে প্রচারিত হচ্ছিল।

ছত্রিশ ঘন্টার মাথায় পৃথিবী থেকে জাহিদকে জানানো হল, পৃথিবীবাসীর অনুরোধে আধ ঘন্টা সময় তাদেরকে সরাসরি পৃথিবীর সব টেলিভিশনে দেখানো হবে। তারা কী করছে না-করছে সে সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষ আগ্রহী। কয়েকজন বিখ্যাত সাংবাদিক মহাকাশ স্টেশনে তাদের সাথে আলাপ করার জন্যে যাবে। মহাকাশ স্টেশন থেকে ওদের বারবার বলে দেয়া হল কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে খুব সতর্ক থাকতে। দেশ এবং জাতির সম্মান জড়িত রয়েছে ওদের উপর।

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই তারা খুব নার্ভাস হয়ে পড়ল। জাহিদ কিংবা কামাল এর আগে কখনোই রেডিও বা টেলিভিশনের সামনে সাক্ষাৎকার দেয় নি। জেসমিন সাক্ষাৎকার না দিলেও ছেলেবেলায় টেলিভিশনে নিয়মিত বিজ্ঞানের উপর অনুষ্ঠান করত। কিন্তু এবারের এটি একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ একই সাথে তাদেরকে দেখবে, তাদের কথাবার্তা শুনবে। ঠিক কীভাবে থাকতে হবে, কী বলতে হবে, এরা ঠিক বুঝতে পারছিল না। অনুষ্ঠান শুরুর আগে আগে তারা চুলগুলি আঁচড়ে নিয়ে নার্ভাস হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

পৃথিবীর সব টেলিভিশনে গত কয়েক ঘন্টা থেকে এই অনুষ্ঠানটির সম্পর্কে ঘোষণা করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীর তিন শ' কোটি লোকের প্রায় সবাই টেলিভিশনের সামনে আগ্রহ নিয়ে বসে রইল। প্রথমে ঘোষক এসে জানিয়ে গেল মহাকাশ থেকে টেলিভিশনে পাঠানো অনুষ্ঠানটি সরাসরি পৃথিবীতে প্রচার করা হচ্ছে। অনুষ্ঠান পরিচালনায় সাহায্য করছেন পৃথিবীর নামকরা কয়জন সাংবাদিক। ধীরে ধীরে টেলিভিশনের স্ক্রীনে একটা ছুঁচালো সিলিন্ডারের মতো মহাকাশযানের ছবি ভেসে উঠল। যদিও সেটি স্থির হয়ে রয়েছে—কিন্তু আসলে এটি ঘন্টায় চল্লিশ হাজার মাইল বেগে ছুটে আসছে। আস্তে আস্তে মহাকাশযানটি ঝাপসা হয়ে গেল, তার জায়গায় ফুটে উঠল যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ মহাকাশযানটির কন্ট্রোল রুম—তিনজন তরুণ-তরুণী সেখানে চুপচাপ অপেক্ষা করে রয়েছে। ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র জাহিদ সোজা হয়ে বসে ধীরে ধীরে বলল, নিঃসঙ্গ মহাকাশযানের তিনজন নিঃসঙ্গ তরুণ-তরুণী পৃথিবীর মানুষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

আপনাদের সাথে আমি এই মহাকাশযানের অভিযাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দিই।

জাহিদ খুব দক্ষতার সাথে পরিচয়পর্ব শেষ করল। সাথে সাথেই একজন সাংবাদিক পৃথিবী থেকে জিজ্ঞেস করল, অনিশ্চিত অবস্থা আপনাদের কেমন লাগছে?

জেসমিন উত্তর দিল, অনিশ্চিত অবস্থা কখনো ভালো লাগার কথা নয়, কিন্তু পৃথিবীর সবাই আমাদের জন্যে অনুভব করছে ভেবে খুব ভালো লাগছে।

ফ্লাইং সসার সম্পর্কে আপনাদের কী অভিমত?

এটা আসলে ফ্লাইং সসার কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলা যাবে না। তবে এটি যাই হোক না কেন, তার উদ্দেশ্য ভালো নয়।

কামাল উত্তপ্ত হয়ে বলল, যদি ধ্বংস না হয়ে থাকে তবে ওটাকে যেভাবে হোক ধ্বংস করতে হবে।

আপনারা কি মনে করেন, এন্ড্রোমিডার অধিপতি হাসান ওটাকে ধ্বংস করতে পেরেছেন?

আমাদের মনে করা না-করায় কিছু আসে যায় না। তবে হাসান স্যার ওটাকে

আঘাত করতে পেরেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পৃথিবীর অনেক দেশেরই কৃত্রিম গ্রহ এবং উপগ্রহ রয়েছে, যেগুলিতে ভয়ানক সব পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। সেগুলি কি ফ্লাইং সসারকে আঘাত করতে পারত না?

জাহিদ সাবধানে উত্তর দিল। বলল, ফ্লাইং সসারটিকে রাডারে খুব কাছে না আসা পর্যন্ত দেখা যায় না। তাই হাসান স্যারের আগে আর কেউ এটাকে আঘাত করতে পারে নি।

এন্ড্রোমিডার অধিনায়ক হাসান সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

কামাল ভারী গলায় বলল, হাসান স্যার সম্পর্কে বলতে হলে আধ ঘন্টার অনুষ্ঠান যথেষ্ট নয়—কয়েক যুগব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। পৃথিবীর সবচেয়ে খাঁটি মানুষ হাসান স্যার—

জাহিদ বাধা দিয়ে বলল, হাসান স্যারের কথা প্রসঙ্গে আমার একটি কথা মনে হল। স্যার আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন পৃথিবীতে পৌঁছে দেবার জন্যে। স্যার মারা যাবার পর চিঠিটা আমি খুলে পড়েছি পৃথিবীতে পাঠানোর জন্যে। আপনাদের আবার পড়ে শোনাচ্ছি।

মহাকাশ বিজ্ঞান সর্বাধিনায়ক।

আমার সুদীর্ঘ চাকরিজীবনে আমি যে পারিশ্রমিক পেয়েছি এবং বিভিন্ন জাতীয় পুরস্কারে আমার যে-অর্থপ্রাপ্তি হয়েছে তার পুরোটুকু জাতীয় অনাথাশ্রমে দিয়ে দিলে বাধিত হব।

বিনীত—
হাসান।

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, একজন মানুষ কতটুকু মহান হলে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে এরকম চিঠি লিখে যেতে পারে—

সর্বনাশ! জেসমিন চিলের মতো তীক্ষ্ম স্বরে চিৎকার করে উঠল-চিৎকার শুনে জাহিদ আর কামালের সাথে সাথে পৃথিবীর তিন শত' কোটি মানুষ একসাথে চমকে উঠল।

রাডার স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে কামাল ফ্যাকাসে রক্তশূন্য মুখে বলল, ফ্লাই-ইং-স-সা-র!!

পরবর্তী তিরিশ সেকেণ্ড সবাই ওদের তিনজনকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার ভয়াবহ দৃশ্য দেখার আশঙ্কায় রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। জাহিদ কাঁপা গলায় বলল, আমরা আর কতক্ষণ বেঁচে থাকব জানি না। ফ্লাইং সসারটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের আঘাত করতে পারে—আমাদের কিছু করার নেই। ওটা এখন খুব কাছে চলে এসেছে। সোজা আমাদের দিকে আসছে। কোথাও এত কাছে কখনও এটি আসে নি। আমরা ওটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কুৎসিত ধাতব একটি চাকতির মতো, উপরে গোল গোল বৃত্ত—বোধ করি জানালা। তিন পাশ দিয়ে নীলাভ আগুন বেরুতে থাকে। প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে আসছে।

জাহিদ জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল, ওটা আরও কাছে এগিয়ে আসছে। আমাদের আঘাত করার বোধ করি কোনো ইচ্ছে নেই—কিন্তু কী করতে চাইছে বুঝতে পারছি না। আরো কাছে এসেছে—আরো কাছে—আ–রো কাছে—

টেলিভিশনের স্ক্রীন বারকয়েক কেঁপে স্থির হয়ে গেল। সুদর্শন ঘোষক এসে ম্লান মুখে বলল, তিনজন তরুণ–তরুণীর ভাগ্যে কী ঘটেছে আমরা বলতে পারছি না। মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে খবর আসামাত্রই আপনাদের জানানো হবে। এখন দেখুন ছায়াছবি রবোটিক ম্যান।

পৃথিবীর তিন শ' কোটি মানুষ বসে বসে বিরক্তিকর ছায়াছবি রবোটিক ম্যান দেখতে লাগল।

পরদিন ভোরে পৃথিবীর মানুষ খবর পেল জাহিদ, কামাল আর জেসমিনকে ফ্লাইং সসারের প্রাণীরা ধরে নিয়ে গেছে। ওদের শূন্য রকেটটি পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। রকেটের দেয়াল গোল করে কাটা!

ফ্লাইং সসারের দেয়ালে পিঠ দিয়ে ওরা তিনজন প্রায় মিনিট সাতেক হল দাঁড়িয়ে আছে। ওদেরকে যেভাবে রকেট থেকে টেনে বের করে আনা হয়েছে—একটু ভুল হলেই ওরা মারা যেতে পারত। ফ্লাইং সসারটি রকেটের গায়ে স্পর্শ করে ও ধার–দেয়াল কেটে বাতাসের চাপকে ব্যবহার করে ওদের তিনজনকে টেনে এনেছে। ওদের সাথে সাথে রকেটের ভেতরকার অনেক টুকরো টুকরো ছোটখাটো যন্ত্রপাতি খুচরা জিনিসপত্র এখানে চলে এসেছে। কামাল তার ভেতর থেকে বেছে বেছে একটা শক্ত লোহার রড হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে—ফ্লাইং সসারের অধিবাসীদের বিপজ্জনক কিছু করতে দেখলে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে!

জাহিদ অনেকক্ষণ হল ধাতব দেয়ালটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিল। কী দেখে কামালকে ডেকে বলল, কামাল, এই স্ক্রুটা দেখে তোর কী মনে হয়?

কামাল উত্তেজিত হয়ে বলল, আরে! এটা তো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ স্ক্রু! পৃথিবীর তৈরি জিনিস!

জেসমিন অবাক হয়ে বলল, মানে?

মানে এটা পৃথিবীতে তৈরি। পৃথিবীর মানুষের কারসাজি! নিশ্চয়ই কিছু পাজি লোক মিলে তৈরি করেছে।

শুধু পাজি বলিস না—জাহিদ বাধা দিয়ে বলল, পাজি এবং প্রতিভাবান। যে–সব ইঞ্জিনিয়ারিং খেল দেখাচ্ছে, মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়।

হাতে পেলে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলতাম—

সাথে সাথে খুট করে একটা দরজা খুলে গেল এবং একজন দীর্ঘ লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। দুই পাশ থেকে দু' জন লোক হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে প্রথমে ঘরে ঢুকে ঘরের দু'পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। কামালকে ইঙ্গিত করল হাতের রডটা ফেলে দিতে। কামাল নীরস মুখে রডটা ছুঁড়ে দিতেই দীর্ঘ লোকটি এসে ঢুকল।

গাঢ় নীল রংয়ের জ্যাকেট আর সাদা প্যান্ট পরনে। মাথায় লম্বা চুল অবিন্যস্ত, মুখে খোঁচা লালচে দাড়ি। গায়ের রং অস্বাভাবিক ফর্সা, তীক্ষ্ণ খাড়া নাক, শক্ত চোয়াল এবং

রক্তাক্ত চোখ দু'টি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

জাহিদের মনে হল লোকটিকে কোথায় যেন দেখেছে, কিন্তু মনে করতে পারছিল না। কামাল বিস্ফারিত চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চিৎকার করে বলল, তুমি হারুন হাকশী!

সাথে সাথে জাহিদ লোকটিকে চিনতে পারল। অসাধারণ প্রতিভাবান হারুন হাকশী মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে নোবেল পুরস্কারের জন্যে মনোনীত হয়েছিল—বয়স কম বলে সেবার দেয়া হয়নি। এক অজ্ঞাত কারণে এত প্রতিভাবান হওয়ার পরও তার রক্তে অপরাধের বীজ ঢুকে গেছে। দু'টি খুন করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল—নাম পাল্টে কিছুদিন এক মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করেছে। ধরা পড়ে মাস ছয়েক জেল খেটে জেল থেকে পালিয়ে যাবার পর তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি।

জাহিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে স্যারদের কাছে হাকশীর গল্প শুনত। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা নাকি একটু পাগলাটে হয়, কিন্তু তারা যে ক্রিমিনালও হতে পারে হাকশী সেই প্রমাণ রেখে গেছে।

হারুন হাকশী খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের লক্ষ করল, তারপর খসখসে রুক্ষ গলায় বলল, লেসার বীম দিয়ে তোমাদের মাঝে কে আমার ফোবোসে আঘাত করেছিলে?

ফোবোস মানে?

ফোবোস হচ্ছে এই মহাকাশযান। পৃথিবীর মানুষেরা যেটাকে ফ্লাইং সসার ভেবে ভয়ে ভিরমি খাচ্ছে!

ও। জাহিদ তাচ্ছিল্যের স্বরে জিজ্ঞেস করল, লেসার বীম তেমন ক্ষতি করতে পারে নি তা হলে?

ক্ষতি যা করার ঠিকই করেছে—তিন ইঞ্চি ব্যাসের ফুটো করে ফেলেছে আগাগোড়া, কিন্তু ঠিক করে ফেলতে সময় লেগেছে মাত্র চব্বিশ ঘন্টা। কে আঘাত করেছিলে, তুমি?

জাহিদের খুব লোভ হচ্ছিল, সে প্রশংসাটুকু নিয়ে হাকশীকে একটু ভয় পাইয়ে দেয়। কিন্তু কী ভেবে সত্যি কথাই বলল। আঘাত আমরা কেউ করি নি, করেছিলেন হাসান স্যার।

কোথায় সে?

এন্ড্রোমিডাতে শেষ পর্যন্ত ছিলেন।

ও। ভালোই লক্ষ্যভেদ করেছিল, প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে লেসার বীম নিয়ে লড়তে আসা ছেলেমানুষি—

কামাল চটে উঠে বলল, ঐ ছেলেমানুষি অস্ত্রই তো তোমার ফোবোসের বারটা বাজিয়ে দিয়েছিল।

কক্ষণো না। ওটা কোনো আঘাতই হয় নি। দেখতে দেখতে আমার টেকনিশিয়ানরা সেরে ফেলেছিল।

আর যারা মারা গেছে, জাহিদ জিজ্ঞেস না করে পারল না; তাদেরকেও কি দেখতে দেখতে প্রাণ দিয়ে দিয়েছ?

হাকশী চমকে উঠে বলল, মারা গেছে, তুমি কেমন করে জানলে?

জাহিদ নির্দোষ মুখে বলল, জানতাম না, এখন জানলাম।

হাকশীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। জাহিদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান দেখছি! কী কর তুমি?

তুমি শুনে কী করবে?

হাকশীর হাসি এক মুহূর্তে মুছে গেল। থমথমে গলায় বলল, শুনবে কী করব?

কী?

তোমাদের এক্ষুণি মেরে বাইরে ফেলে দেব, না আরও কয়েকটা দিন বাঁচিয়ে রাখব, সেটা ঠিক করব।

জাহিদ শান্ত স্বরে বলল, মেরে ফেলার হলে আগেই মেরে ফেলতে, কষ্ট করে দেয়াল কেটে বের করে আনতে না।

হ্যাঁ—কিন্তু দেয়াল কেটে বের করে এনে যদি দেখি কয়েকটা নিষ্কর্মা বুদ্ধিজীবী নিয়ে এসেছি—ছুঁড়ে ফেলে দেব মহাকাশে। বল, তুমি কী কর?

আমি একজন পদার্থবিজ্ঞানী। জাহিদ ঠান্ডা স্বরে বলল, তাত্ত্বিক নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে গত বছর ডক্টরেট করেছি।

চমৎকার! হাকশীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তোমাকে আমার দরকার। বেঁচে গেলে এবার!

হাকশী এবার কামালের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, তুমিও কি পদার্থবিজ্ঞানী?

না। আমি নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর-ইঞ্জিনিয়ার।

কয় বছরের অভিজ্ঞতা আছে?

বেশি না। পাঁচ বছর।

ভেরি গুড। তোমাকে আমার আরও বেশি দরকার। আর এই যে মেয়ে, তুমি কী কর?

আমি জীববিজ্ঞানী। গত বছর ডক্টরেট করেছি মাইক্রো—ঠোঁট উল্টাল, হাকশী বলল, তোমাকে আমার দরকার নেই।

জেসমিন ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। জাহিদ তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে উঠে বলল, মানে?

মানে অতি সহজ। এই মেয়েটির আমার কোনো দরকার নেই। ওকে এক্ষুণি মহাকাশে ফেলে দেয়া হবে—না-না, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমি এমনিতে জ্যান্ত মানুষ মহাকাশে ফেলে দিই না—তার আগে—এখানেই তাকে মেরে নেয়া হবে।

লোকটা ঠাট্টা করছে, না সত্যি সত্যি জেসমিনকে এখানে মেরে ফেলতে চাইছে, জাহিদ প্রথমে বুঝতে পারল না। যখন বুঝতে পারল সত্যি সত্যি সে জেসমিনকে এখানেই গুলি করতে চায়—চিৎকার করে হাকশীর দিকে ছুটে গেল, তুমি পেয়েছটা কি? ভেবেছ—আমরা বেঁচে থাকতে তুমি ওর গায়ে হাত তুলতে পারবে?

কামাল জেসমিনকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলল, ওকে মারতে চাইলে আগে আমাদের মারতে হবে। আর যদি আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে চাও, জেসমিনকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

হাকশী একটু অবাক হল মনে হল। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে বলল, বেশ, এবারে বেঁচে গেলে জেসমিন না কী যেন নাম তোমার! কিন্তু আমার এখানে কেউ

চুপচাপ থাকতে পারে না—একটা-না-একটা কাজ করতে হবে বলে রাখলাম।

জাহিদ ভুরু কুঁচকে বলল, আর যদি না করি?

ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল হাকশী। হাসতে হাসতে বলল, তোমার সাহস তো মন্দ নয় ছেলে! আমার এখানে থাকবে অথচ কাজ করবে না? দেখাই যাক না কাজ না-করে পার কি না!

কামাল চাপা স্বরে বলল, তোমার নিজের উপর বিশ্বাস খুব বেশি মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ, আত্মবিশ্বাস আছে বলে পুরো পৃথিবীকে আমি শাসন করতে যাচ্ছি।

দেখা যাবে—কীভাবে তুমি পৃথিবীকে শাসন কর।

হাকশী সরু চোখে কামালের দিকে তাকাল। বলল, মানে? তুমি কী আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

হ্যাঁ, দেখাচ্ছি। কামাল গোঁয়ারের মতো বলল, আমি সুযোগ পেলে তোমার টুঁটি চেপে ধরে.....

হাকশীর অট্টহাসিতে সব শব্দ চাপা পড়ে গেল। কামালের পিঠ চাপড়ে হাসতে হাসতে বলল, সাবাশ ছেলে, সাবাশ! হাকশীর মুখে মুখে এরকম কথা বলার সাহস দেখিয়েছ, তার জন্যে কংগ্রাচুলেশান!

কামাল একটু চটে উঠে বলল, ঠাট্টা করছ?

মোটেও না। তোমাদের মতো সাহসী ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। এখানে যাদের ধরে এনেছি, তাদের অনেকেই আমার টুঁটি চেপে ধরতে চায়। অথচ প্রথম কথাটি মুখ ফুটে বলার সাহস দেখালে তুমি! তোমার স্পষ্টবাদিতা দেখে ভারি খুশি হলাম। শোন ছেলেরা, তোমাদের নামটা কি জানি না, যাই হোক, তোমাদের আমি অনুমতি দিলাম—তোমরা ইচ্ছে করলে আমার টুঁটি চেপে ধরতে পার।

এখনই যদি ধরি!

ঐ দু'জন লোক তাদের ট্রিগার চেপে ধরলে অন্তত দুইশত বুলেট তোমাদের মোরব্বার মতো কেঁচে ফেলবে। অন্য কখনো যদি সুযোগ পাও, আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করে দেখতে পার। আমি এটাকে তোমাদের শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ভাবব না।

সত্যি বলছ?

হাকশী মিথ্যা কথা বলে না।

ঘুম ভাঙার পর জাহিদ অনেকক্ষণ বুঝতে পারল না কোথায় আছে, কেন আছে বা কীভাবে আছে। তারপর হঠাৎ করে সব মনে পড়ে গেল আর সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে বসল। হালকা আলো জ্বলছে আসবাবহীন ন্যাড়া একটা ধাতব ঘরে, মহাকাশযানে যেরকম হয়। ফোবোস নামের সেই অদ্ভুত মহাকাশযানটি—পৃথিবীর লোকেরা যেটাকে ফ্লাইং সসার হিসেবে ভুল করেছে, সেটি রাত্রে এখানে এসে পৌঁছে দিয়েছে। প্লুটোনিক নামের এই অতিকায় মহাকাশ স্টেশনটি দেখেই চিনতে পারল জাহিদ। সব কয়টি দেশ মিলে যে-মহাকাশ ল্যাবরেটরি তৈরি করেছিল, যেটি দু' বছর আগে খোয়া গিয়েছিল—হারুন হাকশী সেটাকে প্লুটোনিক নাম দিয়ে তার ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে। মৃত্যুদেবতার নাম প্লুটো—থেকে প্লুটোনিক। জাহিদের মনে হল নামটি ভালোই বেছে নিয়েছে। কিন্তু এই প্লুটোনিক পৃথিবী থেকে খুব বেশি একটা দূরে রয়েছে বলে

মনে হল না; তবু পৃথিবীর যাবতীয় রাডারের সামনে এটি অদৃশ্য কেন সে বুঝতে পারল না। নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু করেছে, যার জন্যে রাডারের তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় না।

খুট করে একটা শব্দ হল। দরজা খুলে সন্তর্পণে কামাল এসে ঢোকে।

কি ব্যাপার, মরণ ঘুম দিয়েছিলি মনে হচ্ছে!

হুঁ। ভীষণ ঘুমালাম—খিদে লেগে গিয়েছে, খাবার দেবে কখন?

কে জানে বাপু! খেতে দেবে না খেয়েই ফেলবে কে জানে!

পাশের বাথরুমে জাহিদ হাত-মুখ ধুয়ে এসে দেখে, জেসমিনও এসে হাজির—কামালের পাশে বিষণ্ন মুখে বসে আছে। ভাগ্যচক্রে কোথায় এসে পড়েছে ভেবে ভেবে শীর্ণ হয়ে উঠেছে। জাহিদ জেসমিনকে চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টা করে, কি ব্যাপার প্রাণিবিদ? খাঁচায় আটক প্রাণীগুলি নিয়ে গবেষণা শুরু করে দাও।

দিয়েছি।

কি দেখলে?

মহিলা প্রাণীটি এক সপ্তাহে পাগল হয়ে যাবে!

জাহিদ হা-হা করে হাসল, তারপর বলল, এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন। একটা কিছু করে ফেলব। হাসান স্যারকে দেখ নি, কী রকম ভয়ানক পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কী ভয়ানক সব কাজ করে ফেলেন—

হাসান স্যার হচ্ছেন হাসান স্যার।

কামাল বলল, আমরাও চেষ্টা করে দেখি। জাহিদ, তোর কি মনে হয় কিছু করা যাবে? একটা প্লানিং করলে হয় না?

এই সময় খুট করে দরজা খুলে গেল। একজন ইউরোপীয় মেয়ে হাতে নাস্তার ট্রে নিয়ে এসে ঢুকল, যন্ত্রের মতো খাবার সাজিয়ে আবার যন্ত্রের মতো বেরিয়ে গেল। মহাকাশের বিশেষ ধরনের চৌকোণা খাবারের ব্লক।

খুঁটে খুঁটে খেতে খেতে জাহিদ বলল, ডিটেকটিভ বইতে পড়েছি বন্দিদের ঘরে লুকানো মাইক্রোফোন থাকে। এখানে নেই তো?

খুঁজে দেখলেই হয়।

কে কষ্ট করে খুঁজবে?

জাহিদ কামালের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল, তারপর বলল, আমার মনে হয় এসব এখানে নেই। জাহিদ কী করতে চায় বুঝতে না পেরে কামাল অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল। জাহিদ চোখ মটকে বলল, তোর শার্টের একটা বোতামে যে এক্সপ্লোসিভটা লাগিয়ে রেখেছিলি, সেটা আছে তো?

কিছু না বুঝেই কামাল মিথ্যা কথাটি মেনে বলল, আছে।

বেশ! ওটা চালু কর, পাঁচ মিনিটের ভেতর সবাইকে নিয়ে প্লুটোনিক ধ্বংস হয়ে যাবে।

কামাল দাঁত বের করে হাসল, বুঝতে পেরেছে জাহিদ কী করতে চাইছে। যদি ঘরে মাইক্রোফোন থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এক্সপ্লোসিভটা উদ্ধার করার জন্যে পাঁচ মিনিটের ভিতর কেউ-না-কেউ ছুটে আসবে।

ওরা চুপচাপ বসে রইল, ঠিক পাঁচ মিনিটের সময় দরজা খুলে গেল। সেই ইউরোপীয়ান মেয়েটি আবার যন্ত্রের মতো ঢুকে নাস্তার প্লেট নিয়ে যন্ত্রের মতো বেরিয়ে

গেল।

জাহিদ হেসে বলল, নিশ্চিন্তে প্লানিং করতে পারিস, ঘরে মাইক্রোফোন নেই।

ওরা বসে বসে পরিকল্পনা করার চেষ্টা করে, কিন্তু যেহেতু প্লুটোনিক সম্পর্কে, এখানকার লোকজন, কাজকর্ম সম্পর্কে কোনো ধারণাই এখনো নেই, তাদের পরিকল্পনার কিছুই অগ্রসর হয় না।

ঘন্টা দুয়েক পরে একজন লোক এসে ওদের ডেকে নিয়ে গেল, হারুন হাকশী তাদের জন্যে নাকি অপেক্ষা করছে।

এই প্রথম ওরা প্লুটোনিক ঘুরে দেখার সুযোগ পেল। ঘর থেকে বেরিয়েই দেখে, লম্বা করিডোর, দু'পাশে ছোট ছোট ঘর, প্লুটোনিকের আবাসিক এলাকা। করিডোরের অন্য মাথায় ছোট একটা হলঘরের মতো, পাশেই লিফট। লিফটের পাশে একটা ছোট সুইচ-বক্সের সামনে একজন টেকনিশিয়ান কাজ করছে, আশপাশে স্ক্রু-ড্রাইভার, নাট-বল্টু আর রেঞ্জ ছড়ানো।

জাহিদ, কামাল আর জেসমিনকে মোটেই পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল না, যে-লোকটি পথ দেখিয়ে আনছে সে সামনে সামনে হাঁটছে, পিছন পিছন কেউ আসছে কি না সে বিষয়েও কোনো কৌতূহল নেই। কামাল টেকনিশিয়ানের কাছে এসে এদিক- সেদিক তাকাল, তারপর আলগোছে একটা বড়সড় স্ক্রু-ড্রাইভার তুলে নিল—সে এক বছর জুডো ট্রেনিং নিয়েছিল, খালিহাতেই কীভাবে মানুষ মারতে হয় জানে, তবে এ ধরনের স্ক্রু-ড্রাইভার সাথে থাকলে ব্যাপার সহজ হয়। হারুন হাকশীর কাছাকাছি যেতে পারলে একবার চেষ্টা করে দেখবে, এই লোকটি শেষ হয়ে গেলে পুরো প্লুটোনিকই শেষ হয়ে যাবে!

হারুন হাকশীর ঘরটা আগোছাল, যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। বিভিন্ন মিটার আর স্ক্রীনগুলি সে চিনতে পারল, যে-কোনো মহাকাশযানেই থাকে। তবে অচেনা যন্ত্রপাতির মাঝে রয়েছে একটা চৌকোণা একমানুষ উঁচু ইউনিট, যেটিকে দেখে কম্পিউটার মনে হচ্ছিল, যদিও পরিচিত কম্পিউটারের সাথে এর কোনো মিল নেই। ওরা ঢুকতেই হারুন হাকশী ওদের দিকে না তাকিয়ে বলল, বস। কামাল বসল একপাশে, হারুন হাকশীর নাগালের ভিতর।

হারুন হাকশী একটা ফিতের মতো কাগজে কী যেন মন দিয়ে পড়ছিল—পড়া শেষ হলে কাগজটি রেখে দিয়ে ওদের দিকে তাকাল। তারপর কামালের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, স্ক্রু-ড্রাইভারটি দিয়ে দাও।

কামাল চমকে উঠে হতভম্বের মত পকেট থেকে স্ক্রু-ড্রাইভারটি বের করে। ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষ করে দেবে কি না ভাবছিল, কিন্তু তার আগেই লক্ষ করল হারুন হাকশীর হাতে ছোট একটা রিভলবার। স্ক্রু-ড্রাইভারটি এগিয়ে দিয়ে কামাল হতাশ হয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

হারুন হাকশী রিভলবারটি ড্রয়ারে রেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে নেয়। খানিকক্ষণ একমনে সিগারেট টেনে বলল, তোমাদের ফ্রিপসির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি—এই হচ্ছে ফ্রিপসি—হারুন হাকশী চৌকোণা ইউনিটের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

কি জিনিস এটা ?

কম্পিউটার।

ও। কোন জেনারেশন?

হারুন হাকশী হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, এটা তোমাদের ওসব চতুর্থ শ্রেণীর কম্পিউটার না—যে, জেনারেশন হিসেব করবে। এটি হচ্ছে আমার নিজের হাতে তৈরি কম্পিউটার।

জাহিদ নির্দোষ মুখে বলল, কি করে এটা? গান গায়?

হাকশী চটে উঠে বলল, কি করে, শুনবে? সে ফিতের মতো কাগজটি তুলে নেয়, বলে, শোন আমি পড়ছি, কামাল সম্পর্কে কী লিখেছে শোন ' কামাল হচ্ছে অস্থিরমতি—আপাতত হারুন হাকশীকে কীভাবে হত্যা করা যায় তাই ভাবছে। করিডোরে আসার সময় খুঁটিনাটি লক্ষ করতে করতে আসবে। সুইচ-বক্সের সামনে এসে হঠাৎ করে এদিক-সেদিক তাকিয়ে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার তুলে নেবে। প্রথম সুযোগ পাওয়ামাত্র এটা দিয়ে হাকশীকে হত্যার চেষ্টা করবে। হারুন হাকশী বসতে বলার পর সে পাশে বসবে। বসার তিন মিনিট পর সে লাফিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়বে হারুন হাকশীর উপর—'

শুনতে শুনতে কামালের চোয়াল ঝুলে পড়ল। জাহিদের বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে হাকশী বলল, ফ্রিপসি তোমার সম্পর্কে কী বলেছে শুনবে? এই শোন—সে পড়তে থাকে, সকাল আটটা পঁয়ত্রিশঃ জাহিদ ঘরে গোপন মাইক্রোফোন রয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখার জন্যে হঠাৎ করে কামালকে বলবে—তার শার্টের বোতামে যে-এক্সপ্লোসিভটা ছিল সেটা আছে কি না। তারপর সে কামালকে এটা চালু করতে বলবে। কেউ এক্সপ্লোসিভটা নিতে আসবে না দেখে জাহিদ ভাববে, ঘরে কোনো মাইক্রোফোন নেই.....এখন বুঝতে পারলে ফ্রিপসি কী করে?

তার মানে এটা মানুষের মনের কথা বলে দেয়?

ঠিক মনের কথা বলা নয়—এটা ভবিষ্যৎ বলে দেয়।

ভবিষ্যৎ?

হ্যাঁ, যে-কোনো মানুষ ভবিষ্যতে কখন কী করবে, কখন কী বলবে, সব নিখুঁতভাবে বলে দেয়।

অসম্ভব।

হাকশী হাসিমুখে বলল, বিজ্ঞানী হয়েও এরকম অবৈজ্ঞানিক কথা বলছ! এইমাত্র না নিজের চোখে দেখলে—নিজের কানে শুনলে!

কিন্তু এটা কী করে সম্ভব? কামাল হাত ঝাঁকিয়ে বলল—ভবিষ্যতে কে কী করবে না-করবে সেটা বলা যায় নাকি?

কেন যাবে না! যেমন মনে কর তোমার কথা। আমি যদি তোমার মানসিকতা, তোমার বুদ্ধিমত্তা, তোমার পার্সোনালিটি, তোমার পছন্দ-অপছন্দ সব কিছু নির্ভুল জানতে পারি, তা হলে কখন কী পরিবেশে তুমি কী রকম ব্যবহার করবে আমি মোটামুটি বলতে পারব না?

কামাল খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, মোটামুটি হয়তো বলতে পারবে।

আর যদি একটি অসাধারণ কম্পিউটারকে একজন মানুষের চরিত্রের যাবতীয় খবর দেয়া হয়, সে কি নিখুঁতভাবে বলতে পারবে না, কী পরিবেশে তার কী রকম

ব্যবহার করা উচিত?

কিন্তু আমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সে কেমন করে জানবে?

তোমার কণ্ঠস্বরের একটিমাত্র শব্দ যদি ফ্রিপসি শুনতে পায়, সে নিখুঁত বলে দেবে তোমার চরিত্র কেমন!

সে কেমন করে সম্ভব?

তোমার চরিত্রের উপর নির্ভর করবে তোমার কণ্ঠস্বর, শব্দের বিভিন্ন অংশে তোমার দেয়া গুরুত্ব, উচ্চারণভঙ্গি। তোমার আমার কানে সেগুলি ধরা পড়বে না—কিন্তু ফ্রিপসি সেটা মুহূর্তে ধরে ফেলতে পারে। যেখানে ফ্রিপসির একটিমাত্র শব্দ শুনলেই চলে, সেখানে আমি প্লুটোনিকে এমন ব্যবস্থা করেছি যেন সে প্রতিমুহূর্তে প্লুটোনিকের প্রত্যেকটি মানুষের প্রত্যেকটা কথা শুনতে পায়, প্রত্যেকটা ভাবভঙ্গি দেখতে পায়।

মানে?

মানে এই প্লুটোনিকের প্রতি সেন্টিমিটার ফ্রিপসি প্রতিমুহূর্তে দেখতে পায়—প্রত্যেকটা নিশ্বাসের শব্দ সে শুনতে পায়! টেলিভিশন, ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন দিয়ে পুরো প্লুটোনিক ঘিরে রাখা হয়েছে!

জাহিদ কামালের দিকে তাকাল—কামাল বিরস মুখে হেসে বলল,—কি জন্যে এত সাবধানতা?

হাকশী একটু গম্ভীর হয়ে বলল, আমি যে পরিকল্পনামাফিক কাজ করছি, সেখানে সাবধান না হলে চলে না।

কি তোমার পরিকল্পনা?

সময় হলেই জানবে। আমার পরিকল্পনামাফিক কাজ করতে হলে শ' দুয়েক প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী, শ' তিনেক প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার আর টেকনিশিয়ান দরকার। কিন্তু সবাই যে আমার পরিকল্পনাকে ভালো চোখে দেখবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কাজেই অনেককে আমার জোর করে ধরে আনতে হয়েছে।

জেসমিন চমকে উঠে বলল, বছরখানেক আগে হঠাৎ করে যে-সব বিজ্ঞানী অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল তাদের তুমি ধরে এনেছ?

হাকশী হাসিমুখে বলল, হ্যাঁ। যাদের আমি এখানে নিয়ে এসেছি তাদের সাথে আমার চুক্তি হচ্ছে—দু' বছরের। ঠিক দু' বছর তারা এখানে কাজ করবে, তারপর আমি তাদের পৃথিবীতে ফেরত পাঠাব।

জেসমিন জিজ্ঞেস করল, আমাদেরও কি দু' বছর থাকতে হবে?

হাকশী খানিকক্ষণ কি ভেবে বলল, আসলে তোমাদের ধরে আনার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু লেসার দিয়ে আমার ফোবোসে ফুটো করার সময় আমার অনেকগুলি লোক মারা পড়েছে—বিশ্বস্ত সব লোক! বুঝতেই পারছ, আমি যখন অপারেশনে যাই সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোকগুলি নিয়ে যাই। কাজেই আমার কয়েকজন লোক কম পড়ে গেছে—বাধ্য হয়ে হাতের কাছে যাদের পেয়েছি ধরে এনেছি।

জেসমিন আবার জিজ্ঞেস করল, আমাদের কি দু' বছর পর ছেড়ে দেবে?

হাকশী বাঁকা করে হেসে বলল, তোমাদের সাথে আমার কোনো চুক্তি নেই—দু' বছর পর ছেড়ে দেব একথা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।

জেসমিন কাতর হয়ে বলল, হাকশী! আমাদের সাথে অন্য রকম ব্যবহার করে

তোমার লাভ?

হাকশী হেসে বলল, কেন তোমরা আমাকে ধ্বংস করে যাবে?

জেসমিন চুপ করে রইল। ফ্রিপসির মতো একটি কম্পিউটার যেখানে সবার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে, পৃথিবীর সেরা সেরা সব প্রতিভাবান ব্যক্তিরা যেখানে অসহায়ভাবে বন্দি হয়ে রয়েছে সেখানে তারা কতটুকু কি করতে পারবে?

হাকশী ধূর্ত চোখে হাসতে হাসতে বলল, এখন বুঝতে পারছ, আমি কেন এত সাবধান হয়ে থাকি?

শ' চারেক প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান আমার হয়ে কাজ করছে—যদিও তাদের একজনও আমাকে দু' চোখে দেখতে পারে না। পৃথিবীর অন্য যে-কোনো ব্যক্তি হলে অনেক আগেই এদের হাতে মারা পড়ত—আমি বলে টিকে আছি। শুধু টিকে আছি বললে ভুল হবে—এদের কাছ থেকে আমার কাজও আদায় করে নিচ্ছি। কিন্তু কেউ আমার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করে নি।

জাহিদ দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, যেদিন সুযোগ আসবে—

আসবে না। যদি কখনো আসে, সে-সুযোগ গ্রহণ করার অনুমতি আমি আগেই দিয়েছি। তবে হ্যাঁ—

কি?

খুব ধীরে ধীরে হাকশীর মুখ শক্ত হয়ে গেল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, দু'বারের বেশি কেউ সুযোগ পাবে না। প্রথম দু'বার আমি ক্ষমা করে দিই—কিন্তু যেই মুহূর্তে কেউ তৃতীয়বার আমাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে—আমি নিজ হাতে তাকে শাস্তি দিই।

কি রকম শাস্তি?

শুনবে? তা হলে শোন। একজন জার্মান ছোকরাকে খালিগায়ে মহাকাশে ছেড়ে দিয়েছিলাম। এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে সে বেলুনের মতো ফেটে গিয়েছিল!

জেসমিন শিউরে উঠে বলল, কী করেছিল ছেলেটা?

কামালের মতো আমাকে মারতে চেষ্টা করেছিল। প্রথমবার ইলেকট্রিকে শর্ট সার্কিট করে, দ্বিতীয়বার দম বন্ধ করে, তৃতীয়বার হাতুড়ির আঘাত দিয়ে। কোনোবারই কিছু করতে পারে নি। পরিকল্পনা করার সাথে সাথেই ফ্রিপসি আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল—

মানে? শুধু পরিকল্পনা করেছিল, আর অমনি তুমি ওকে মেরে ফেললে?

হাকশী জাহিদের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, তুমি কি ভাবছ এখানে কোনো পরিকল্পনা করে সেটা কাজে লাগানোর মতো সুযোগ কাউকে দেয়া হয়?

কামাল অধৈর্য হয়ে বলল, তা হলে যে-কেউ একবার একবার করে তিনবার পরিকল্পনা করলেই তুমি তাকে শাস্তি দেবে? কিছু না করলেও?

না—পরিকল্পনা করার স্বাধীনতা রয়েছে—কিন্তু তুমি যদি সেটা বাস্তবায়ন করার জন্যে সময় ঠিক কর, তাহলেই আমি একবার ওয়ার্নিং দেব। দ্বিতীয়বার আবার যদি কবে কোথায় কি করবে ঠিক কর, তা হলে শেষ ওয়ার্নিং। তৃতীয়বার—

হাকশী কথা বন্ধ করে গলার উপর ছুরি চালানোর ভান করল।

জাহিদ হাকশীর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধীরে ধীরে ধরাল, তারপর আপন মনে বলল, তার মানে তোমায় কীভাবে কোথায় শেষ করব ভাবতে কোনো বাধা নেই, কিন্তু যেই মুহূর্তে সময় ঠিক করব অমনি তুমি একবার সুযোগ দেয়া হয়েছে বলে ধরে নেবে!

হ্যাঁ।

যদি তুমি বা তোমার ফ্রিপসি কিছু জানতে না পার, আর তার আগেই তোমায় শেষ করি?

হাকশী হো-হো করে হেসে বলল, চেষ্টা করে দেখতে পার। তোমার পুরো স্বাধীনতা রয়েছে!

ঘড়িতে একটা শব্দ হল। অমনি হাকশী উঠে দাঁড়াল, বলল, আমার সময় হয়েছে—তোমাদের কার কি কাজ করতে হবে, সব এই ফাইলটায় লেখা রয়েছে। আজ বিকেল থেকেই কাজ শুরু করে দাও।

হাকশী একটা ফাইল ওদের দিকে এগিয়ে দেয়। জাহিদ বিরস মুখে ফাইলের পৃষ্ঠা ওল্টাতে থাকে—খুঁটিনাটি বিষয় সবকিছু লেখা রয়েছে—কখন কবে কি কাজ করতে হবে তার নিখুঁত বিবরণ।

হাকশী চলে যাচ্ছিল—জেসমিন ডেকে ফেরাল, হাকশী—আমাদের কতদিন থাকতে হবে বললে না?

হাকশী হেসে বলল, কেন? আমায় ধ্বংস করে নিজেরা মুক্ত হয়ে যাবে না?

জাহিদ হেসে বলল, এক শ' বার যাব।

তাহলে আমায় জিজ্ঞেস করছ কেন?

জেসমিন জাহিদের কথায় ভরসা পায় না—ও বুঝতে পেরেছে হাকশীর বিরুদ্ধে যাওয়া অসম্ভব। হাকশী ইচ্ছে করলেই শুধুমাত্র এখান থেকে বের হওয়া যেতে পারে। কাজেই হাকশীকে না চটিয়ে সে সময়টুকু জেনে নিতে চাচ্ছিল। আবার জিজ্ঞেস করল—আমাদের কতদিন থাকতে হবে বললে না।

হাকশী ধূর্তমুখে হেসে বলল, বেশ, তোমরাও তা হলে দু' বছর পর মুক্তি পাবে।

দু-ব-ছ-র।

হাকশী চলে গেলে জেসমিন আঙুলে গুনে গুনে দেখতে থাকে দু' বছর মানে কতদিন। কিছুক্ষণেই সে হতাশ হয়ে পড়ে।

প্লুটোনিকের জীবনযাত্রা ভারি বিচিত্র। যাদেরকে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে ধরে আনা হয়েছে, তারা প্রথম কয়দিন খুব ছটফট করে, বিদ্রোহ-বিক্ষোভ করতে চায়, হৈচৈ চেঁচামেচি করে। কিন্তু ফ্রিপসির অদৃশ্য চোখ-কান আর অলৌকিক ক্ষমতার সামনে কয়দিনেই সবাই শিশুর মতো অসহায় হয়ে পড়ে। কয়দিন পরেই তাদের সবরকম বিদ্রোহ-বিক্ষোভের ঝোঁক কেটে যায়—তখন জেলখানায় আটক বন্দিদের মতো মাথা গুঁজে কাজ করে যায় আর দিন গুনতে থাকে কবে বন্দিজীবন শেষ করে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে।

হাকশী বাইরে কোথায় কি করছে না-করছে সে সম্পর্কে প্লুটোনিকের কাউকেই একটি কথাও বলে না। প্লুটোনিকের লোকজন যখন জাহিদ আর কামালের মুখে শুনতে

পেল মহাকাশের সব মহাকাশযান হাকশী ধ্বংস করে ফেলেছে, তখন তাদের বিস্ময়, হতাশা আর আক্রোশের সীমা থাকল না। কিন্তু কিছু করার নেই—বুকের আক্রোশ বুকে চেপে রেখে সবাই নিজের কাজ নিজে করে যেতে লাগল। এই নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার একটিমাত্র উপায় হচ্ছে আত্মহত্যা করা—কিন্তু আত্মহত্যা করতে পারে কয়জন?

হাকশী কি জন্যে মহাকাশযান, কৃত্রিম গ্রহ, উপগ্রহ ধ্বংস করে বেড়াচ্ছে সেটার কোনো সদুত্তর জাহিদ খুঁজে পায় না। প্লুটোনিকের অনেকে হয়তো হাকশীর কাছে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শুনেছে, কিন্তু ফ্রিপসির ভয়ে কেউ তাদের কিছু জানাল না। সুযোগ পেয়ে একদিন সে নিজেই হাকশীকে জিজ্ঞেস করল তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি। হাকশী ওকে যা বোঝাল, সেটি যেরকম আজগুবি, ঠিক ততটুকু সঙ্গতিহীন।

সে নাকি পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনার একটা মহান পরিকল্পনা নিয়েছে। বিভিন্ন দেশ নিজেদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে বেড়ায়—কিন্তু সব দেশ মিলে যদি একটিমাত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয় তাহলে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার উপায় থাকবে না। কোনো দেশ তো আর নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে না! পৃথিবীর সব দেশ একত্র হওয়া নাকি তখনই সম্ভব, যখন একটি মহাশক্তি তাদের পরিচালনা করবে। হারুন হাকশী হবে সেই মহাশক্তি—মহাকাশ পুরোপুরি দখল করে নেয়ার পর সে সমস্ত পৃথিবীর কর্তৃত্ব পেয়ে যাবে—যখন খুশি যে-কোনো দেশে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে। পৃথিবী তখন বাধ্য হবে তার কথা শুনতে।

সব শুনে জাহিদ বুঝতে পেরেছে, হাকশী হচ্ছে একটি উন্মাদ। কিন্তু এই উন্মাদের যে ক্ষমতা রয়েছে এবং সেটাকে কাজে লাগানোর যে প্রতিভা রয়েছে সেটা সত্যিই ভয়ংকর!

প্রথম কয়দিন ছটফট করে জাহিদ আর কামাল কাজে মন দিয়েছে। দু' জনেই কাজ করে ডিক টার্নার নামে একজন বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর অধীনে। লোকটা একটা ছোটখাট পাষণ্ড। সুযোগ পেলে সে হাকশীর পিঠেও ছোরা বসাতে পারে—কিন্তু হাকশীর নিজের অল্প কয়জন লোকজনের মাঝে ডিক টার্নার হচ্ছে অন্যতম। ডিক টার্নার নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টরের বিশেষজ্ঞ। নিজে নূতন ধরনের রি-অ্যাক্টর ডিজাইন করেছে, সেটি আপাতত ফোবোসে কাজ করছে।

জাহিদের কাজ ছিল জ্বালানি তৈরি করার জন্যে ইউরেনিয়ামের আইসোটোপ[৫] আলাদা করা। একঘেয়ে রুটিনবাঁধা কাজ। কাজ করতে করতে জাহিদ হাঁপিয়ে ওঠে, কিন্তু এছাড়া আর কিছু করার নেই। নিজের কাজ সে মন দিয়ে করে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করে, আর সব সময়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে—নির্দিষ্ট ভরের ইউরেনিয়াম ২৩৫ আলাদা করে 'ক্রিটিক্যাল মাস'[৬] করে ফেলতে পারে কি না। পারমাণবিক বোমার জন্যে 'ক্রিটিক্যাল মাস' কত সেটি তার জানা রয়েছে—কিন্তু সে পরিমাণ ইউরেনিয়ামের আইসোটোপ সে কখনও হাতে পায় না। হাকশীর সাথে দেখা হলেই হাকশী হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে, কি হে পদার্থবিদ, অ্যাটম বোমা তৈরির কতদূর!

ফ্রিপসির দৌলতে জাহিদ পরিকল্পনা করার আগেই হাকশী সেটা জেনে গেছে।

কামালের কাজ ছিল রি-অ্যাক্টরের কাছাকাছি। অতিকায় রি-অ্যাক্টরের খুঁটিনাটি অনেক কিছু তাকে লক্ষ করতে হত। কাজে ফাঁকি দেয়ার উপায় ছিল না—ফ্রিপসি সব

সময় নজর রাখত। রি-অ্যাক্টরকে বিকল করে দেবার অনেকগুলি পথ কামাল ভেবে বের করেছে। হাকশী সেগুলি সবকয়টাই জানত। অবসর পেলে হাকশী কামালের সাথে সেগুলি নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করত। কারণ হাকশী খুব ভালো করেই জানত, কামাল কোনো দিনও ফ্রিপসির চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেগুলি কাজে লাগাতে পারবে না।

জেসমিনের অবস্থা ছিল সবচেয়ে শোচনীয়। একটা নূতন ধরনের ভাইরাস[৭] নিয়ে তার গবেষণা করতে হচ্ছে। কি রকম অবস্থায় ভাইরাসগুলি কি ধরনের ব্যবহার করে তার একটি দীর্ঘ চার্ট করে তার সময় কাটে। এই ভাইরাসটি মানুষের মস্তিষ্কে আক্রমণ করে মানুষকে বোধশক্তিহীন করে ফেলে। হাকশী কোথায় এটি ব্যবহার করবে ভেবে জেসমিনের দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না। জেসমিন কয়দিন হল আত্মহত্যা করার কথা ভাবছে। হাকশী ফ্রিপসির কাছ থেকে সে খবর পেয়েছে অনেকদিন আগে। তবে এ নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। জেসমিন যদি সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করে তা হলে ভালোই হয়—ওকে বাঁচিয়ে রাখার আসলে কোনো প্রয়োজন নেই। কামাল আর জাহিদের চাপে পড়ে ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছে।

আস্তে আস্তে যতই দিন পার হতে লাগল, ওরা তিনজনই বোধশক্তিহীন যন্ত্র হয়ে যেতে লাগল। জেসমিনকে সাহস দিয়ে বেড়াত কামাল—ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করত—কিন্তু আসলে তাতে খুব একটা লাভ হত না। নিজেও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী নয়।

একটা অক্ষম স্থবিরতা ওদের গ্রাস করে ফেলছিল ধীরে ধীরে। তার থেকে বুঝি কারো মুক্তি নেই!

জাহিদ বুঝতে পেরেছে সে হাকশীর কাছে হেরে গেছে। অনেক অহঙ্কার করে সে হাকশীকে বলেছিল তার প্লুটোনিক ধ্বংস করে দিয়ে সে প্রতিশোধ নেবে—কিন্তু তার কথা সে রাখতে পারে নি। ফ্রিপসি নিখুঁতভাবে প্রতিটি চিন্তাভাবনা হাকশীকে জানিয়ে দিয়েছে। মানুষের মনের গোপন ভাবনাটিও যখন একজন প্রতিমুহূর্তে জেনে নেয়, তখন তার মতো অসহায় বুঝি আর কেউ অনুভব করে না। জাহিদ বিষণ্নমুখে গোল জানালাটি দিয়ে মহাকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে—এইদিক দিয়ে কোটিখানেক মাইল দূরে পৃথিবী। পৃথিবীতে ফিরে যাবার প্রচণ্ড আকাঙ্খা তাকে প্রতিমুহূর্তে বেঁচে থাকার প্রেরণা দিচ্ছে—এ ছাড়া সে বোধ করি পাগল হয়ে যেত। অবসর সময়ে সে হিসেব করে দেখে দু' বছর শেষ হতে আর কত দেরি। গোল জানালা দিয়ে নিকষ কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখের সামনে পৃথিবীটা ভেসে ওঠে। তার দেশে এখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ কালো করে মেঘ হয়ে বিজলি চমকাচ্ছে, গুরুগুরু মেঘের ডাক—

জাহিদ।

জাহিদ বাস্তবে ফিরে এল—ঘুরে দেখে, কামাল। আজকাল ওদের দেখা হয় কম, কথাবার্তা হয় আরো কম। প্লুটোনিকের অন্য একজন সাধারণ অধিবাসীর সাথে কামালের পার্থক্য দিনে দিনে কমে আসছিল—সে নিজেও তেমনি একজন প্লুটোনিকের যন্ত্র হয়ে উঠছিল। অনেকদিন পরে কামালকে দেখে জাহিদের হঠাৎ করে আরো বেশি মন-খারাপ হয়ে গেল। কয়দিন আগেও তারা দু'জন একসাথে এড্রোমিডাতে হৈচৈ

করে বেড়িয়েছে।

কি রে কামাল, কিছু বলবি?

জাহিদ—কামালের চোখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে।

জাহিদ ভারি অবাক হল। প্লুটোনিকের এই একঘেয়ে জীবনে এমন কী ঘটনা ঘটতে পারে, যা কামালকে এত উত্তেজিত করে তুলতে পারে? কামালকে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

কামাল কোনো কথা না বলে জাহিদের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বাথরুমে। ফ্রিপসির জন্যে প্লুটোনিকের সর্বত্র রয়েছে অজস্র চোখ আর কান—টেলিভিশন ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন। কোন ঘরে কোথায় আছে সেটা কারো জানা নেই। কামাল অনেক খুঁজে বাথরুমের টেলিভিশন ক্যামেরাটি বের করেছিল, ডান পাশে আয়নার ঠিক নিচে ছোট্ট একটি গোল ফুটো, তার পিছনেই রয়েছে টেলিভিশন ক্যামেরা। কামাল একটা তোয়ালে দিয়ে সেটা ঢেকে দিল। তারপর ট্যাপ আর শাওয়ার খুলে পানির শব্দ দিয়ে মাইক্রোফোনটিকে অচল করে দিয়ে জাহিদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

জাহিদ এতক্ষণ কামালের প্রস্তুতি দেখে ভারি অবাক হয়। কামাল এমন কী কথাটি বলবে যেটি ফ্রিপসিকে জানতে দিতে রাজি নয়? ফ্রিপসি জানে না এমন কিছুই যখন তাদের জানা নেই! কামালকে জিজ্ঞেস করল, কি বলবি?

কামাল খুব নিচু গলায় বলল, আমি জেসমিনকে ভালবাসি, তুই জানিস?

শুনে জাহিদ ভারি অবাক হল—এটি এমন কোনো বিচিত্র ব্যাপার নয়। সে নিজে প্রেম-ভালবাসার ব্যাপারে মোটেই স্পর্শকাতর নয়, কিন্তু কামালের জন্যে এটি খুবই স্বাভাবিক—বিশেষ করে যখন পরিস্থিতি হঠাৎ করে তাদের এরকম অবস্থায় এনে ফেলেছে। জাহিদ অবাক হল এই ভেবে যে, এ কথাটি বলার জন্যে এত সতর্কতা কেন? সে কামালের দিকে তাকিয়ে বলল, তাতে কী হয়েছে?

কামাল কাঁপা গলায় বলল, ফ্রিপসি জানে না!

জাহিদ ভীষণ চমকে উঠল—চেঁচিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, কী বলিলি!

আস্তে! ফ্রিপসি শুনতে পাবে! আজ দুপুরে হাকশীর ঘরে গিয়েছিলাম ভেন্টিলেশান টিউব পরীক্ষা করতে। হাকশীর সাথে গল্প করে আমার সম্পর্কে ফ্রিপসির আজকের রিপোর্টটা দেখতে চাইলাম, এমনি ইচ্ছে হচ্ছিল দেখতে। কি কারণে জানি ব্যাটার মন ভালো ছিল, দেখতে দিল। আমার সম্পর্কে ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। পাঁচটার সময় জেসমিনকে নিয়ে ছ'তলায় গিয়ে নিরিবিলি গল্প করব ঠিক করে রেখেছিলাম—অথচ ফ্রিপসি লিখেছে—পাঁচটার সময় তোর সাথে আলাপ করব। কীভাবে কার্বন মনোক্সাইড ব্যবহার করে হাকশীকে খুন করা যায়—

তুই ঠিক দেখেছিস?

হ্যাঁ—তাই জেসমিনের সাথে দেখা না করে পাঁচটা বাজতেই তোর কাছে চলে এসেছি।

ফ্রিপসির তাহলে প্রেম-ভালবাসা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। উত্তেজনায় জাহিদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল, ফিসফিস করে বলল, আমাদের আগেই এটা বোঝা উচিত ছিল—ফ্রিপসি তো যন্ত্র। প্রেম-ভালবাসা বুঝবে না। কেউ প্রেমে পড়লেই তার সম্পর্কে ভুল খবর দেবে।

হ্যাঁ—কামালের চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে। এই সুযোগ—ফ্রিপসি ভাবছে তোর সাথে কার্বন-মনোক্সাইড নিয়ে আলাপ করছি। এই ফাঁকে একটা সত্যিকার পরিকল্পনা করে ফেল।

এত তাড়াতাড়ি! ভাবতে হবে না? সময় দরকার—

আর কখনো সময় নাও পেতে পারিস।

জাহিদ চুল খামচে ধরে বলল, যে-পরিকল্পনাই করিস না কেন, সবচেয়ে প্রথম ফ্রিপসিকে বিকল করতে হবে—এ ছাড়া কিছু করা যাবে না।

সম্ভব না—ফ্রিপসিকে নষ্ট করা যাবে না। ভীষণ কড়া পাহারায় থাকে।

নষ্ট না করে—ওটাকে বিকল করা যায় না?

কামাল দু'-এক মুহূর্ত ভাবল, বলল, যায়।

কীভাবে?

ইলেকট্রিসিটি যদি বন্ধ করে দেয়া যায়।

সেটা কীভাবে করবি?

কামাল মাথা চুলকাল—সবার সামনে দিয়ে ফ্রিপসির ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দেয়া একেবারেই অসম্ভব!

আচ্ছা! এক কাজ করা যায় না?

কি?

নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টরটা বন্ধ করে দেয়া যায় না? তাহলেই তো প্লুটোনিকের পুরো পাওয়ার বন্ধ হয়ে যাবে!

কীভাবে করবি? টার্নার ওখানে শকুনের মতো বসে থাকে।

তুই তো নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টরের ইঞ্জিনিয়ার, এখানে ঢুকে কিছু করতে পারিস না?

কামাল ভাবতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে বলে, তুই যদি টার্নারকে খানিকক্ষণ অন্য দিকে ব্যস্ত রাখতে পারিস, তা হলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

কীভাবে করবি?

বলছি শোন্—কামাল জাহিদকে পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে বলতে থাকে, জাহিদ গম্ভীর হয়ে শোনে।

ঠিক সেই সময়ে হাকশী ছুটে আসছিল ওদের খোঁজে—ফ্রিপসি জরুরি বিপদসংকেত দিয়েছে।

বাথরুমের দরজা খুলে হাকশী এবং তার পিছনে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে নাকভাঙা আমেরিকানটাকে দেখে জাহিদ বুঝতে পারল, ওরা ধরা পড়ে গেছে।

হাকশী সরু চোখে ওদেরকে খানিকক্ষণ লক্ষ করল, তারপর কামালকে বলল, তোয়ালেটা ওখান থেকে সরিয়ে রাখ। ট্যাপগুলি বন্ধ কর।

কামাল তোয়ালেটা সরিয়ে নিয়ে খোলা ট্যাপগুলি বন্ধ করে দেয়—এতক্ষণ পানির ঝিরঝির শব্দে কান অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল—হঠাৎ করে নীরবতা অস্বাভাবিক ঠেকল।

হাকশী গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কী নিয়ে আলাপ করছিলে?

জাহিদ ভিতরে ভিতরে চমকে উঠল, কিন্তু বাইরে খুব শান্ত ভাব বজায় রেখে বলল, তোমার ফ্রিপসিকে জিজ্ঞেস কর।

ফ্রিপসিকে জিজ্ঞেস করেই এসেছি—

তা হলে আর আমাদের জিজ্ঞেস করছ কেন?

হাকশী খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, ভবিষ্যতে এরকম কাজ করবে না।

কী রকম কাজ?

টেলিভিশন ক্যামেরা আর মাইক্রোফোনকে এড়িয়ে যাওয়া।

দু' -এক মিনিটের জন্যে গেলে ক্ষতি কি?

সে কৈফিয়ত আমি তোমাকে দেব না। ফ্রিপসির চোখের আড়াল হওয়া চলবে না। যদি আড়াল হওয়ার চেষ্টা কর, সোজাসুজি মহাকাশে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

বেশ!

আর কার্বন-মনোক্সাইড ব্যবহার করে খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না—প্লুটোনিকে বিষাক্ত গ্যাস বিশুদ্ধ করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

জাহিদ চমকে ওঠার ভান করল—তারপর মুখে একটা আশাভঙ্গের ছাপ ফুটিয়ে তুলল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে বিজয়োল্লাসে ফেটে পড়ছিল, হাকশী ধরতে পারে নি—ফ্রিপসি ধরতে পারে নি—ফ্রিপসিকে ধোঁকা দিয়ে ওরা ওদের মাথায় করে এক ভয়ানক পরিকল্পনা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

হাকশী চলে যাওয়ার পর জাহিদ খুব ধীরে ধীরে কামালের দিকে তাকিয়ে আছে—যদি কিছু বুঝে ফেলে? কামাল জাহিদের চোখের দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু বুঝে ফেলল। চোখের ভাষা বুঝে নেবার মতো ক্ষমতা ফ্রিপসির নেই, তাই ফ্রিপসি জানতেও পারল না এই দু' জন কী সাংঘাতিক পরিকল্পনা ছকে ফেলেছে।

জাহিদ সারারাত (প্লুটোনিকে দিন-রাত নেই—সুবিধের জন্যে খানিকটা সময়কে রাত নাম দিয়ে সবাই ঘুমিয়ে নেয়) খুব দুশ্চিন্তায় কাটাল—ওর কাজকর্ম ভাবভঙ্গি যদি ফ্রিপসির ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে মিলে না যায়, তাহলে হাকশী সন্দেহ করতে পারে। জাহিদ খুব সাবধানে কথা বলছিল—যখন ঠিক যেমনটি করা উচিত তখন ঠিক তেমনটি করে যাচ্ছিল। অন্ততপক্ষে একটি সপ্তাহ এভাবে কাটাতে হবে। সবচেয়ে মুশকিল কামালের সাথে এ বিষয়ে আর একটি কথাও বলা যাবে না। অপেক্ষা করে থাকতে হবে কবে কামালের কাছ থেকে সেই সংকেতটি আসে।

হাকশী প্রথম দু'দিন খুব অস্বস্তির সাথে দেখতে পেল জাহিদ আর কামালের কথাবার্তা ভাবভঙ্গি প্রায়ই ফ্রিপসির ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে খাপ খাচ্ছে না। যদিও খুবই ছোটখাটো ব্যাপার, কিন্তু বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সে সতর্ক থাকল এবং গোপন পাহারার ব্যবস্থা করল। তিন দিনের মাথায় আবার সব ঠিক হয়ে যাবার পর সে নিশ্চিন্ত হল, যদিও ব্যাপারটি দেখে তার বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

খাবার টেবিলে কাপে চা ঢালতে গিয়ে কামালের হাত থেকে খানিকটা চা ছলকে পড়ল। জেসমিন বিরক্ত হয়ে বলল, যেটা পার না সেটা করতে যাও কেন? দেখি, আমাকে দাও।

জেসমিন চা ঢেলে দিতে থাকে। জাহিদ খুব ধীরে ধীরে কামালের চোখের দিকে তাকাল। বুঝতে পারল আজকেই ঘটবে সেই ব্যাপারটা! টেবিলে চা ফেলে দেয়া

আকস্মিক ঘটনা নয়—জাহিদকে সতর্ক করে দেয়া। চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল—যার যার কাজে যাবে।

প্লুটোনিকের সমস্ত শক্তি আসে ছ'তলায় বসানো নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর থেকে। ব্যাপারটার পুরো দায়িত্বে রয়েছে ডিক টার্নার। জাহিদ টার্নারের ঘরে নক করে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কামাল চলে গেল রি-অ্যাক্টরের কাছে। পাঁচ-ছয়জন টেকনিশিয়ান এখানে-সেখানে কাজ করছে—সবাই চুপচাপ—মুখে পাথরের কাঠিন্য। কামাল তার নিজের জায়গা ছেড়ে আরও ভিতরে চলে গেল।

রি-অ্যাক্টরে আজ জ্বালানি প্রবেশ করানোর দিন—জ্বালানিগুলি প্লুটোনিকের ল্যাবরেটরিতেই ইউরেনিয়ামের বিভিন্ন আইসোটোপ থেকে আলাদা করা হয়। প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয় সেসব জ্বালানি খুব সাবধানে রাখা হয়। টার্নার ছাড়া আর কেউ সেখানে হাত দিতে পারে না।

কামাল দ্রুতহাতে স্বচ্ছ একটা পোশাক পরে নিতে থাকে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের কাছে যেতে হলে এই পোশাক পরে নিতে হয়। উপরে আরো এক প্রস্থ সিলোফেনের পোশাক পরে নেয়া নিয়ম—কামাল সে জন্যে অপেক্ষা করল না। সে দ্রুত পায়ে কন্ট্রোল-রুমে ঢুকে পড়ে। পরপর তিনটি ভারী দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতে হয়। শেষ দরজাটি বন্ধ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এতক্ষণে বাইরে নিশ্চয়ই হৈচৈ শুরু হয়ে গেছে।

ফ্রিপসি যখন দেখবে তার ভবিষ্যদ্বাণীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কামাল এরকম একটা বেআইনি কাজ করে ফেলছে, নিশ্চয়ই তখন সাইরেন বাজিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেবে। ডিক টার্নার যখন খবর পাবে কামাল কন্ট্রোল-রুমে ঢুকে পড়েছে, তখন সে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে পড়বে। বাইরে থেকে পাওয়ার বন্ধ করে দিয়ে তাকে বিপদে ফেলতে পারে, কিন্তু পরবর্তী পনের মিনিট টার্নারকে কোনো-না-কোনোভাবে আটকে রাখার দায়িত্ব জাহিদের। কামাল সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না—খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করে দিল। জ্বালানির ছোট ছোট টিউবগুলি পাল্টে দিতে হবে। ওগুলি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় রি-অ্যাক্টরের ভেতরে চলে যাবার জন্যে ট্রের উপরে সামনে আছে—কামাল সেগুলি টেনে নামিয়ে আনল। তারপর খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করে দিল—যদিও সে জানতেও পারল না তাড়াতাড়ি করার আর কোনো দরকার ছিল না। যার ভয়ে সে এত তাড়াহুড়ো করছিল, সেই ডিক টার্নার তখন গুলি খেয়ে টেবিলের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে-আর কোনো দিনও তার ওঠার ক্ষমতা হবে না।

জাহিদ ডিক টার্নারের ঘরে ঢুকে একটা কাল্পনিক সমস্যা নিয়ে আলাপ জুড়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল। এমনিতে লোকটা নিতান্ত পাষণ্ড হলেও পদার্থবিজ্ঞান এবং যুক্তিবিদ্যায় তার অকৃত্রিম উৎসাহ রয়েছে। সত্যি সত্যি সে জাহিদের সাথে সমস্যাদি নিয়ে আলাপ করতে থাকে। কিন্তু যেই মুহূর্তে ফ্রিপসি সাইরেন বাজিয়ে দিয়ে জানিয়ে দিল কামাল হঠাৎ করে বেআইনিভাবে জ্বালানিঘরে ঢুকে পড়েছে, তখন টার্নার লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল; কি করবে বুঝতে না পেরে চিৎকার করে জাহিদকে বলল, পাওয়ার বন্ধ কর।

জাহিদ ঠাণ্ডা গলায় বলল, কেন?

সাথে সাথে টার্নার বুঝে গেল ষড়যন্ত্রে জাহিদও রয়েছে। সে নিচু হয়ে ড্রয়ার থেকে

একটা ছোট রিভলবার বের করে এবং জাহিদের দিকে তাক করে ধরল। জাহিদ ভেবেছিল ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে এবং কীভাবে আরো খানিকক্ষণ ওকে ব্যস্ত রাখা যায় মনে মনে ঠিক করে নিচ্ছিল। কিন্তু টার্নার ভয় দেখানোর ধারেকাছে গেল না, সোজাসুজি তাকে গুলি করে বসল। শেষমুহূর্তে লাফিয়ে সরে যাওয়ার জন্যেই হোক, টার্নারের অপটু হাতের ভুল নিশানার জন্যেই হোক, জাহিদের ডান হাতের খানিকটা মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো ক্ষতি হল না। জাহিদকে লক্ষ করে দ্বিতীয়বার গুলি করার চেষ্টা করার সময় জাহিদ মরিয়া হয়ে টার্নারের উপর লাফিয়ে পড়েছে—রিভলবার কেড়ে নিতে গিয়ে হ্যাঁচকা টানে ট্রিগারে চাপ পড়ে একটা গুলি ওর মাথার ভিতর দিয়ে চলে গেছে। ফলস্বরূপ টার্নার এখন শীতল দেহে টেবিলে উপুড় হয়ে পড়ে আছে—থিকথিকে রক্তে চারদিক ভেসে যাচ্ছে আর তাই দেখে জাহিদের গা গুলিয়ে উঠছে।

জাহিদ রিভলবারটা টেবিলের উপর রাখল—বাইরে ভীষণ হৈচৈ চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছে। হাকশী আর তার দলবল ছুটে আসছে। হাকশীও কি টার্নারের মতো দেখামাত্র গুলি করে বসবে? নাকি ওর কথা শোনার জন্যে খানিকক্ষণ সময় নেবে? কামাল এতক্ষণে কী করল কে জানে! জাহিদ রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। দু'মিনিটের ভিতর দরজায় হাকশী এসে দাঁড়াল, পিছনে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে নাকভাঙা আমেরিকানটা।

জাহিদ সেকেণ্ড দশেক অপেক্ষা করল, না। হাকশী এখন তাকে মারবে না। তাহলে এ-যাত্রায় সে বেঁচে যেতেও পারে। খুব কষ্ট করে জাহিদ মুখে হাসি ফুটিয়ে এনে বলল, টার্নারের কাণ্ড দেখেছ! খামোকা গুলি খেয়ে মারা পড়ল! কী দরকার ছিল আমাকে গুলি করার?

হাকশী কোনো উত্তর দিল না। চোখ দু'টিকে ছুরির মতো করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

হাকশীর বিশেষ নির্দেশে সবাই এসে জমা হয়েছে বড় হলঘরে। প্রথমবার দেখা গেল হাকশীর দেহরক্ষীরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে হলঘরের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা কফিন। কফিনে টার্নারের মৃতদেহ। একপাশে গম্ভীর মুখে হাকশী, অন্য পাশে জাহিদ আর কামাল দু'জনের হাতেই হাতকড়া। উপস্থিত সবাই বিশেষ বিচলিত—কথাবার্তা নেই মোটেও। কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছে কী ঘটে দেখার জন্যে। জেসমিনকে ভীষণ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে—একটা চেয়ার ধরে কোনোভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে জাহিদ আর কামালকে লক্ষ করছে—দেখে মনে হয় সে যেন ওদের চিনতে পারছে না।

তোমরা সবাই শুনেছ—হাকশী অনেকটা বক্তৃতার ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করল, জাহিদ আর কামাল মিলে টার্নারকে হত্যা করেছে—

মিথ্যা কথা। জাহিদ বাধা দিল, আমি কখনোই টার্নারকে হত্যা করি নি। আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল টার্নার—ফ্রিপসিকে জিজ্ঞেস করে দেখ। বেকায়দা গুলি খেয়ে নিজেই মরেছে—

হাকশী এমন ভান করল যে, জাহিদের কথা শুনতে পায় নি। চাপা খসখসে স্বরে বলে যেতে লাগল, সে শুধু যে টার্নারের মতো প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে

তাই নয়—রি-অ্যাক্টরের কন্ট্রোল-রুমে ঢুকেছিল বিনা অনুমতিতে—তাদের এই অবাধ্যতার শাস্তি দেয়া হবে এখনই, এখানেই। এমন শাস্তি দেব যে পৃথিবীর মানুষ শুনতে পেলে আতঙ্কে শিউরে উঠবে।

জেসমিন একটা আর্তস্বর করে চেয়ারে বসে পড়ল। সবাই তাকে একনজর দেখে হাকশীর দিকে ঘুরে তাকাল।

জাহিদ আলগোছে হাত তুলে ঘড়িটা দেখল। সাড়ে এগারোটা বাজতে এখনও মিনিট কয়েক বাকি রয়েছে। হাকশীকে আরও খানিকক্ষণ আটকে রাখতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

হাকশী জাহিদ আর কামালের দিকে তাকিয়ে গলার স্বরে বিষ মিশিয়ে বলল, আমার দলের সর্বশ্রেষ্ঠ লোকগুলির একজনকে হত্যা করার অপরাধের শাস্তি নেয়ার জন্যে প্রস্তুত হও।

কী করতে চায় হতভাগাটা? জাহিদ মনে মনে ঘেমে উঠলেও বাইরে শীতল ভাব বজায় রেখে বলল, হাকশী, তুমি যদি সত্যি সত্যি টার্নারকে হত্যা করার জন্যে শাস্তি দিতে চাও, তা হলে শুধু আমাকেই সে শাস্তি দিতে হবে। তুমি খুব ভালো করে জান দুর্ঘটনাটা যখন ঘটেছে তখন কামাল সেখানে ছিল না।

তার মানে এই নয় পরিকল্পনাটাতে কামালের কোনো ভূমিকা ছিল না। তা ছাড়া—হাকশী! কামাল হাকশীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আমাদের তোমার বিরুদ্ধে যাবার সুযোগ দিয়েছিলে। বলেছিলে, দু'টি সুযোগ দেবে—তৃতীয়বার শাস্তি দেবে! তা হলে প্রথমবারেই আমাদের শাস্তি দিতে চাইছ কেন?

শুনবে, কেন প্রথমবারই তোমাদের শেষ করে দিচ্ছি?

জাহিদ বুঝতে পারল হাকশী কী বলবে—কিন্তু মুখে কৌতূহল ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন?

কারণ তোমরা দুজন কী-একটা আশ্চর্য উপায়ে ফ্রিপসিকে ধোঁকা দিয়েছ। ফ্রিপসি তোমাদের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েছে। তোমাদের এই ভয়ংকর পরিকল্পনা সম্পর্কে আমায় কিছুই বলে নি।

উপস্থিত সবাই ভয়ানক চমকে উঠল—সেখানে দেয়াল ফেটে একটা জীবন্ত পরী বেরিয়ে এলেও বুঝি লোকজন এত অবাক হত না। সেকেণ্ড দশেক সবাই দমবন্ধ করে থেকে একসাথে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। হাকশী কঠোর স্বরে ধমকে উঠল, থাম—

সাথে সাথে হঠাৎ দপ করে সব আলো নিভে গেল। লোকজনের প্রচণ্ড কোলাহলের মাঝে জাহিদ শুনতে পেল, ঘড়িতে ঠিক সাড়ে এগারোটা বাজার ঘন্টা পড়ছে।

কেউ এক পা নড়বে না—তা হলে গুলি করে সবার বুক ঝাঁঝরা করে দেয়া হবে। অন্ধকারে হারুন হাকশী নিষ্ঠুরভাবে চেঁচিয়ে উঠল, সবাই মেঝেতে হাত রেখে বসে পড়—মেঝে থেকে দু' ফুট উঁচু দিয়ে গুলি করা হবে। সবাই হুড়মুড় করে বসে পড়েছে, জাহিদ তার শব্দ পেল। পরমুহূর্তে একঝাঁক গুলি তাদের মাথার উপর দিয়ে দেয়ালে গিয়ে বিঁধল।

জাহিদ মুখ টিপে হাসল, হারুন হাকশী ভয় পেয়েছে। দারুণ ভয় পেয়েছে। অন্ধকারে সে হাত বাড়িয়ে কামালের হাত স্পর্শ করে চাপ দিল—কামাল সত্যি সত্যি

তাহলে জ্বালানির টিউব পাল্টে দিতে পেরেছে। সাড়ে এগারোটায় নতুন জ্বালানি দিয়ে কাজ শুরু করানোর সাথে সাথে তাই সবকিছু বন্ধ হয়ে গেছে।

একটা চাপা শব্দ করে প্লুটোনিকের নিজস্ব ডায়নামো চালু হয়ে গেল খানিকক্ষণের মধ্যেই। ধীরে ধীরে মিটমিটে ভৌতিক আলো জ্বলে উঠল। আবছা আলোছায়াতে দেখা গেল, মেঝেতে শ' চারেক লোক মাথানিচু করে গুড়ি মেরে বসে আছে, হাকশীর গোটা চারেক দেহরক্ষী তাদের দিকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র তাক করে আছে। জাহিদ এবং কামালের দিকে অন্য দু'জন দেহরক্ষী টিগারে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। হাকশী অন্ধকারে সরে গেছে অনেক ভেতরের দিকে, নিরাপদ দূরত্বে। আলো জ্বলে ওঠার পর সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে এল। উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ করে বলল, তোমরা একজন একজন করে বেরিয়ে নিজেদের ঘরে চলে যাও। আজ তোমাদের সবার ছুটি। মনে রাখবে, ঘরের বাইরে কাউকে পাওয়া গেলে সাথে সাথে গুলি করা হবে!

লোকগুলি ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর একজন একজন করে বেরিয়ে যেতে লাগল। শেষ লোকটি বেরিয়ে যাবার পর হাকশী জাহিদ এবং কামালের দিকে এগিয়ে এল। বলল, এটাও তোমাদের কাজ, না?

জাহিদ দাঁত বের করে হাসল। হালকা স্বরে বলল, তোমার কী মনে হয়? ভূতের?

ঠাট্টা রাখ। প্রচণ্ড শব্দে হাকশী ধমকে উঠল—তোমার সাথে আমি তামাশা করছি না।

জাহিদ শীতল স্বরে বলল, দেখ হাকশী, তুমি আর চোখ রাঙিয়ে কথা বলার চেষ্টা করো না। তোমাকে আমরা আর এতটুকু ভয় পাই না। নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর নষ্ট করে এসেছি, ওটা যদি ঠিক করতে পার—জাহিদ একটু হাসল—হ্যাঁ, যদি তোমার টেকনিশিয়ানরা ঠিক করতে পারে, শুধু তাহলেই প্লুটোনিক বেঁচে যাবে। আর তা যদি না পার, তা হলে সেই মুহূর্তে তোমার ঐ ধুকপুকে ডায়নামোটা শেষ হয়ে যাবে—আলো, তাপ, বাতাস, খাবার পানি সবকিছুর অভাব শুরু হয়ে যাবে। খুব বেশি হলে দশ দিন বেঁচে থাকতে পারবে—

স্কাউণ্ড্রেল! তোমরা বেঁচে যাবে ভাবছ?

মোটেই না। জাহিদ উদারভাবে হাসে, অনেক দিন বেঁচেছি, আর বাঁচার শখ নেই। তোমাকে শেষ করে যদি মারা যাই, খোদা নির্ঘাত বেহেশতে আমাকে একটা প্রাসাদ বানিয়ে দেবে। হুর পরী—

চুপ কর! তোমার কথাও আমি বিশ্বাস করি না। আমি টেকনিশিয়ানদের পাঠাচ্ছি। ওরা রি-অ্যাক্টর ঠিক করবে। তারপর—হাকশী দাঁত চিবিয়ে কী যেন বলার চেষ্টা করে— তার আগেই কামাল হো-হো করে হেসে উঠে বলল, হাকশী, জাহিদের কথা বিশ্বাস নাই-বা করলে! আমার কথা বিশ্বাস করবে? তা হলে শোন, আমি হচ্ছি রি-অ্যাক্টর ইঞ্জিনিয়ার। আমাকে শেখানো হয় রি-অ্যাক্টর কীভাবে তৈরি করা হয়, তার কোথায় কি থাকে, রি-অ্যাক্টরের কোন অংশে কি করলে সেটার কি পরিমাণ ক্ষতি হয়, আমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। অবশ্যি টার্নার জানত, কিন্তু বেচারা মাথা-গরম করে মারা পড়ল। কামাল চুকচুক শব্দ করে খানিকক্ষণ দুঃখ প্রকাশ করল।

তুমি কী বলতে চাও?

এখনো বোঝ নি? তা হলে শোন, জাহিদ যখন টার্নারকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছিল, তখন আমি কন্ট্রোল-রুমে কী করছিলাম, তুমি জান?

হাকশী কী বলতে গিয়ে থেমে গেল।

হ্যাঁ—ফ্রিপসি জানত। কিন্তু রি-অ্যাক্টর ঠিক না হলে ইলেকট্রিসিটি চালু হবে না, ইলেকট্রিসিটি চালু না হলে ফ্রিপসি চালু হবে না, আর ফ্রিপসি চালু না হলে তুমি জানতেও পারবে না আমি কী করেছি! আর সেটা যদি না জান, কোনোদিন রি-অ্যাক্টর চালু হবে না। কেমন মজা, দেখেছ?

জাহিদ মুখে একটা সরল ভাব ফুটিয়ে এনে হাকশীকে উপদেশ দেয়ার চেষ্টা করল, তোমার ইমার্জেন্সি ডায়নামোটার পুরো ইলেকট্রিসিটিটা ব্যবহার করে দেখ না, ফ্রিপসিকে চালু করা যায় কি না?

হাকশী জাহিদের কথা না শোনার ভান করল, কারণ সে খুব ভালো করে জানে ইমার্জেন্সি ডায়নামোর ক্ষমতা এত কম যে, প্লুটোনিকের সব ঘরে আলো পর্যন্ত জ্বালাতে পারে না—সেটি দিয়ে ফ্রিপসিকে চালু করা আর ইঁদুরছানা দিয়ে স্টীম রোলার টেনে নেয়ার চেষ্টা করা এক কথা।

হাকশী সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে সারা হলঘর ঘুরে বেড়াতে থাকে। বুঝতে পেরেছে, এরা দু'জন মিলে রি-অ্যাক্টরে একটা-কিছু করে এসেছে, সেটা কী ধরনের কাজ, কে জানে। নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর যথেষ্ট জটিল জিনিস। এটার বিরাট যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটি অসংখ্য ইউনিটের কোথায় কি করে এসেছে জানতে না পারলে সেটা ঠিক করা মুশকিল। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ না হলে সেটি একেবারে অসম্ভব। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ছিল টার্নার—সে মারা যাওয়ার পর কামাল ছাড়া আর কেউ নেই।

হাকশী কামালের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি যদি রি-অ্যাক্টরটা ঠিক করে দাও তাহলে তোমায় আমি ক্ষমা করে দেব!

ক্ষমা! কামাল খুব অবাক হবার ভান করল, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে? আমি আরো ভাবছিলাম কী করলে তোমায় ক্ষমা করা যায়! হাতে হাতকড়া রয়েছে তো কী হয়েছে—ক্ষমতাটুকু যে তোমার হাতে নেই বুঝতে পারছ না!

ভেবে দেখ কামাল! নিষ্ঠুর যন্ত্রণাময় মৃত্যু—

থাক থাক, মিছিমিছি কঠিন ভাষা ব্যবহার করে লাভ নেই। আমার নিষ্ঠুর মৃত্যু হলে তোমার মৃত্যুটি কি আর মধুর মৃত্যু হবে? একটু আগে আর পরে, এই যা। এ ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই।

প্রচণ্ড ক্রোধে হাকশীর চোখ ধকধক করে জ্বলে উঠল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, বেশ! তাহলে ফোবোসে করে এক্ষুণি আমি পৃথিবীতে যাচ্ছি! পৃথিবীর সেরা সব রি-অ্যাক্টর ইঞ্জিনিয়ারদের ধরে আনব, তারপর দেখি।

জাহিদ হাসিমুখে বলল, একটা পাল নিয়ে যেও!

মানে?

মানে তোমার ফোবোস তিন মিনিটের বেশি চলবে না। ওটার রি-অ্যাক্টর বন্ধ হয়ে গেলে আর পৃথিবীতে পৌঁছুতে হবে না! মাঝখানে মঙ্গলের উপগ্রহ হয়ে ঝুলে থাকবে। তখন পাল টানিয়ে যদি যেতে পার—

হাকশী রসিকতায় এতটুকু হাসির ভঙ্গি করল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জাহিদের দিকে

তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল জাহিদের কথা কতটুকু সত্যি। তারপর ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, বেশ, কী করতে হয় আমি দেখব। সবাইকে যদি মরতেই হয়, চেষ্টা করে দেখব কারো কারো মৃত্যু যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়ক করা যায় কি না। বিজ্ঞানী হাকশীকে দেখেছ, উন্মাদ হাকশীকে দেখেছ, নিষ্ঠুর হাকশীকেও দেখেছ, স্যাডিস্ট হাকশীকে দেখবে এবার।

জাহিদ ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলেও বাইরে সেটা প্রকাশ করল না। হাকশীর দু'জন দেহরক্ষী হাকশীর আদেশে ওদের নিয়ে গেল দু'টি ছোট খুপরিতে। তালা মেরে রাখল আলাদা আলাদা। পরস্পর যেন কথা না বলতে পারে কোনোভাবে।

ছোট ঘরটার শক্ত মেঝেতে শুয়ে শুয়ে জাহিদ পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখে। ঠিক যেরকমটি আশা করছিল সেরকমটিই ঘটেছে। হারুন হাকশীর হাত থেকে তাসের টেক্কা চলে এসেছে তাদের হাতে। এখন ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে হয়। হাকশী নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে নিজের লোকজন দিয়ে রি-অ্যাক্টর ঠিক করে ফেলতে। কিন্তু সেটা সম্ভব হবে না। কামাল অনেক ভেবেচিন্তে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা মাফিক রি-অ্যাক্টর দু'টিকে বিকল করেছে। কেউ যদি ঠিক করতেও পারে তাহলেও সেগুলি চালু করতে পারবে না। কারণ জ্বালানি হিসেবে যে-ছোট টিউবগুলি ব্যবহার করা হবে, তার ভেতরে এখন আসল আইসোটোপগুলি নেই।

জাহিদের ইচ্ছে হচ্ছিল আনন্দে একটু নেচে নেয়—কিন্তু সারা দিনের ধকলে খুব ক্লান্ত হয়ে আছে—একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার। হাতকড়াগুলির জন্যে অস্বস্তি হচ্ছিল, ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে থাকা ভারি ঝামেলা, তবুও কিছুক্ষণের মাঝে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

চোখে তীব্র আলো পড়তেই জাহিদ ধড়মড় করে উঠে বসল। হাতে টর্চলাইট নিয়ে হাকশীর দেহরক্ষীরা ঘরে ঢুকেছে। জাহিদকে বেরিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। হঠাৎ করে কী হল বুঝতে না পেরে জাহিদ বাইরে বেরিয়ে আসে। কামালকেও ডেকে তুলে আনা হয়েছে।

কী হল? ঘুমুচ্ছিলাম, ডেকে তুললে, মানে?

জাহিদের কথার উত্তর না দিয়ে নাকভাঙা আমেরিকানটা তাকে পিছন থেকে ধাক্কা দিল সামনে এগিয়ে যেতে।

খাঁটি বাংলায় একটা দেশজ গালি দিয়ে সে এগুতে থাকে। হারুন হাকশীর ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ভেতরে ঢুকেই বুঝতে পারে হাকশী হঠাৎ করে কেন তাদের ডেকে এনেছে।

ঘরের মাঝেখানে একটা চেয়ারে জেসমিন বসে আছে। হাত দুটো পিছন দিকে শক্ত করে বাঁধা। জেসমিনের চোখ আতঙ্কে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ওদের দু'জনকে দেখে সে হু-হু করে কেঁদে উঠল।

কামাল ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল—তার আগেই ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হাকশীর দেহরক্ষীরা ওকে তুলে ধরে চেয়ারের সাথে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। জাহিদ যদিও উন্মত্ততার কোনো লক্ষণ দেখায় নি, কিন্তু হাকশীর নির্দেশে তাকেও একটা চেয়ারে বেঁধে ফেলা হল।

এতক্ষণ পর হাকশীর মুখের ভাব সহজ হয়ে আসে। সে হাসিমুখে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে একটা সিগারেট ধরায়, তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলে, তোমরা বুদ্ধিমান ছেলে! নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি কী করতে চাইছি।

কামাল আর জাহিদ কোনো কথা বলল না। তীব্র দৃষ্টিতে হাকশীর দিকে তাকিয়ে রইল।

হাকশী ঘরে হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে অনেকটা আপন মনে বলতে থাকে, প্রথমে ভেবেছিলাম তোমাদের উপরই পরীক্ষাটা চালাব। কাউকে কোনো কিছু স্বীকার করানোর জন্যে প্রাচীনকালে কিছু কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা হত। যেমন নখের নিচে গরম সুচ ঢুকিয়ে দেয়া, লোহার শিক গরম করে শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় ছ্যাঁকা দেয়া, পা বেঁধে উপর থেকে ঝুলিয়ে রাখা, পানির বালতিতে মাথা ডুবিয়ে রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও বীভৎস পদ্ধতি আছে, যেমন শরীর ছিঁড়ে সেখানে অ্যাসিড লেপে দেয়া, সীসা গরম করে কানে ঢেলে দেয়া, সাঁড়াশি দিয়ে একটা করে দাঁত তুলে নেয়া, আলপিন দিয়ে চোখ গলিয়ে দেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। বলে এগুলি শেষ করা যায় না।

হাকশী তার বক্তৃতার ফলাফল দেখার জন্যে একবার আড়চোখে ওদের দু'জনকে দেখে নিল, তারপর আবার বলতে শুরু করল, প্রথমে ভেবেছিলাম তোমাদের দু'জনের উপর এই পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর সারিয়ে নেব। কিন্তু পরে মনে হল, তোমরা যেরকম একগুঁয়ে, হয়তো দাঁত কামড়ে মরে যাবে তবু রাজী হবে না। তখন এই মেয়েটার কথা মনে হল। মনে আছে প্রথম যেদিন ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম, ওর জন্যে তোমাদের দরদ কেমন উথলে উঠেছিল?

হারামজাদা—শুওরের বাচ্চা! কামালের মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল রাগে।

মিছিমিছি কেন মুখ খারাপ করছ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব—লাভ নেই কিছু। তার চেয়ে আমার কথা শোন। আমি যদি তোমাদের সামনে এই মেয়েটার গায়ে হাত দিই, তোমাদের কেমন লাগবে? যদি মনে কর নখের নিচে সুচ ঢুকিয়ে দিই? কিংবা ঝুলিয়ে রেখে চাবুক মারি—

মেরে দেখ না কুত্তার বাচ্চা—তোর গুষ্টি যদি আমি—

হাকশী হা-হা করে হেসে উঠল। বলল, রক্ত গরম তোমার কামাল সাহেব। মাথা ঠাণ্ডা রাখ। আমি ইচ্ছে করলে এখন এই মেয়েটার শরীর চাকু দিয়ে চিরে ফেলতে পারি, চোখ তুলে ফেলতে পারি, দাঁত ভেঙে ফেলতে পারি—তোমাদের বসে দেখতে হবে। পারবে?

শুওরের বাচ্চা!

আমার কথার উত্তর দাও। পারবে দেখতে? একটু থেমে বলল, পারবে না। এসব দৃশ্য দেখতে ভালো লাগে না—বিশেষ করে যদি সেটি কোনো পরিচিত মেয়ের উপর করা হয়। কাজেই আমার প্রস্তাবটা শোন—এই মুহূর্তে তোমরা দু' জন নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর দু'টি ঠিক করে দাও। যদি রাজি না হও, তাহলে—হাকশী দাঁত বের করে হাসল।

জেসমিন এতক্ষণ একটি কথাও বলছিল না। এবারে কান্নায় ভেঙে পড়ল। ভাঙা গলায় বলল, তোমরা ওর কথায় রাজি হয়ো না। ও একটা পিশাচ। আমার জন্যে ভেবো না—যা হবার হবে! তোমরা কিছুতেই ওর কথায় রাজি হয়ো না।

হাকশী দু' পা এগিয়ে আসে। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, তোমার জন্যে ভাবতে নিষেধ করছ? অত্যাচার সহ্য করতে পারবে তাহলে?

জেসমিন ভীত চোখে তাকাল হাকশীর দিকে। হাকশী আরো ঝুঁকে পড়ে ওর দিকে। হাতের সিগারেটটা তুলে ধরে বলে, পরীক্ষা হয়ে যাক একটা, দেখি কতটুকু সহ্যক্ষমতা।

খবরদার! কামালের চিৎকারে সারা ঘর কেঁপে উঠল, কিন্তু হাকশীর মুখের মাংসপেশী এতটুকু নড়ল না। হাসিমুখে সিগারেটের আগুনটা জেসমিনের গলায় চেপে ধরল।

বন্ধ কর—বন্ধ কর বলছি শুওরের বাচ্চা, নইলে—প্রচন্ড ক্রোধে কামাল কথা বলতে পারে না।

জেসমিন শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ঠোঁট কামড়ে ধরল। মুহূর্তে ওর সারা মুখ টকটকে লাল হয়ে ওঠে আর বিন্দু বিন্দু ঘামে ভিজে ওঠে। কুঁচকে ওঠা চোখের ফাঁক দিয়ে উষ্ণ পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে আর সে প্রচণ্ড যন্ত্রণাকে সহ্য করার জন্যে প্রাণপণে ঠোঁট কামড়ে ধরে। ঠোঁট কেটে দু' ফোঁটা রক্ত ওর চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ল—পোড়া মাংসের একটা মৃদু গন্ধ ঘরে ছড়িয়ে পড়ল ধীরে ধীরে।

কামাল চোখ বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে বসে নিজের ভিতরের প্রচণ্ড আক্রোশটা আটকে রাখতে চাইছিল। এবারে আর সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে উঠল, ঠিক আছে শুওরের বাচ্চা, আমি রাজি।

হাকশীর মুখের হাসিটা আরো বিস্তৃত হয়ে উঠল, এই তো বুদ্ধিমান ছেলের মতো কথা। সে সিগারেটটা সরিয়ে এনে সেটাতে একটি টান দিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসে, তাহলে এখনই কাজে লেগে যাও!

এখন পারব না। জাহিদ শীতল স্বরে বলল, বিশ্রাম নিতে হবে, কাল ভোরের আগে সম্ভব না।

বেশ। তাহলে বিশ্রাম নাও। কাল দশটার ভেতরে আমি সবকিছু ঠিকঠাক দেখতে চাই—

মামাবাড়ির আবদার পেয়েছ? একটা জিনিসের বারটা বাজাতে দু' মিনিট লাগে—কিন্তু সেটা ঠিক করতে দু' বছর লেগে যায়, জান না?

সে আমার জানার দরকার নেই। দশটার ভেতর ঠিক করে যদি না দাও তোমাদের জেসমিনকে আস্ত দেখতে পাবে না।

হাকশী। বাজে কথা বলে লাভ আছে কিছু? যেটা অসম্ভব সেটা আমরা কেমন করে করব? তুমি কি ভাবছ আমাদের কাছে আলাদীনের প্রদীপ আছে? ইচ্ছে করব আর ওমনি হয়ে যাবে?

কতক্ষণ লাগবে তা হলে?

সেটা না দেখে বলতে পারব না। এক সপ্তাহ লাগতে পারে, বেশিও লাগতে পারে।

হাকশী খানিকক্ষণ কী যেন ভাবল, তারপর বলল, ঠিক আছে, তোমাদের এক সপ্তাহ সময় দিলাম। এর ভেতর সব যদি ঠিকঠাক করে দিতে পার—আমি নিজে সবকিছু পরীক্ষা করে দেখব, তারপর তোমাদের জেসমিন ছাড়া পাবে।

আর আমরা?

তোমরা? হাকশীর মুখে ধূর্ত একটা হাসি ফুটে উঠল। তোমাদের ব্যাপার পরে। তোমাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ! সেগুলি বিচার না করে কিছু বলতে পারব না।

দেখ হাকশী, জাহিদ নরম সুরে বলল, তুমি তো দেখলে আমাদের ক্ষমতা কতটুকু—ফ্রিপসির মত কম্পিউটারকে ঘোল খাইয়ে প্লুটোনিক প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। নেহায়েত জেসমিনের জন্যে শেষরক্ষা করতে পারলাম না! ঠিক কি না?

হাকশী স্বীকার করল যে, সত্যিই তা হতে যাচ্ছিল।

এবারে আমি আর কামাল যদি সুযোগ বুঝে নিজেদের ডান হাতের শিরাটা কেটে দিই তাহলে কেমন হয়?

মানে?

মানে আমরা যদি সুইসাইড করি তাহলে তোমার প্লুটোনিকের অবস্থাটা কী হয়?

কে আর ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করতে চায়। তবে প্লুটোনিকের রি-অ্যাক্টর ঠিক করে দেয়ার পর আমাদের যদি তুমি বিচারের নাম করে শেষ করে ফেল, তা হলে আগেই সুইসাইড করে ফেলাটা কি ভালো নয়? তাতে আমরাও মরব; তুমি তোমার দলবল নিয়ে মরবে। জেসমিনও মারা যাবে তবে অত্যাচারটা সহ্য করতে হবে না। আমরাই যদি না থাকি, কাকে ভয় দেখানোর জন্যে ওর উপর অত্যাচার করবে?

হাকশী খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর গম্ভীর মুখে বলল, কি চাও তাহলে তোমরা?

আগে কথা দাও, রি-অ্যাক্টর ঠিক করে দেয়ার পরমুহূর্তে আমাদের তিনজনকে পৃথিবীতে ফেরত দিয়ে আসবে, তা হলেই আমরা কাজ শুরু করব।

হাকশী সরু চোখে জাহিদের দিকে তাকিয়ে থেকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, বেশ, কথা দিলাম।

তোমার কথায় বিশ্বাস করব কেমন করে?

সেটা তোমাদের ইচ্ছে। কিন্তু আমার কথাকে বিশ্বাস না করলে আর কিছু করার নেই।

জেসমিন হঠাৎ চিৎকার করে বলল, ওর কথা বিশ্বাস করো না। খবরদার, ওর কথা বিশ্বাস করো না—

কিন্তু জাহিদ আর কামাল হাকশীর কথা বিশ্বাস করল, কারণ এ ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

এক সপ্তাহ সময় শেষ হয়ে গেছে। আর ঘন্টাখানেক পরে জাহিদের হাকশীকে সবকিছু ঠিক করে বুঝিয়ে দেয়ার কথা। এই একটি সপ্তাহ জাহিদ আর কামাল প্রায় জন ত্রিশেক টেকনিশিয়ানকে নিয়ে কাজ করেছে। যদিও রি-অ্যাক্টরের ত্রুটিটি ছিল সাধারণ, কিন্তু কামাল টেকনিশিয়ানদের সাহায্যে পুরো রি-অ্যাক্টর সম্পূর্ণ টুকরো টুকরো করে খুলে ফেলেছে, তারপর আবার জুড়ে দিয়েছে। ঠিক কোথায় কি জিনিসটি সারা হল, কোনো টেকনিশিয়ান বুঝতে পারে নি। বোঝার দরকারও ছিল না।

এই দীর্ঘ সময়টিতে জাহিদ একটা স্ক্রুও হাত দিয়ে নেড়ে দেখে নি। সে বসে বসে দিস্তা দিস্তা কাগজে কী-একটা অঙ্ক কষে গেছে। অঙ্কটির আকার-আকৃতি দেখে বোঝা যাচ্ছে, কম্পিউটারে কষা উচিত ছিল—কিন্তু এখানে সে কম্পিউটার পাবে কোথায়? তা ছাড়া অঙ্কটি সে কাউকে দেখাতে চায় না। ছয়দিনের মাথায় সে শুধু কামালকে একটা চিরকূটে কয়েকটা সংখ্যা লিখে দিল। সে-রাত্রে কামাল সব

টেকনিশিয়ানকে ছুটি দিয়ে একা একা অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেছে। প্রথমে প্লুটোনিকের রি-অ্যাক্টরে, পরে ফোবোসের রি-অ্যাক্টরে। কি করেছে সেই জানে।

ফ্রিপসি অচল বলে হাকশী জাহিদ আর কামালের কাজকর্মে নাক গলাতে পারছিল না। কিন্তু সে গলাতে চাইছেও না। জেসমিনের খাতিরে এরা দু' জন যে রি-অ্যাক্টর দু'টি ঠিক করে দেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কখন কি করছে না-করছে সে তাতে উদ্বিগ্ন হল না। সে শুধুমাত্র ভয় পাচ্ছিল এই অসহায় অবস্থায় পৃথিবীর মানুষ যদি তাকে আক্রমণ করে বসে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তার প্লুটোনিক আর ফোবোস—দু'টিই পৃথিবীর রাডারের চোখে অদৃশ্য। সব রকম বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ এরা শোষণ করে নিতে পারে।

নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘন্টা আগেই কামাল আর জাহিদ হাকশীকে ডেকে পাঠাল। হাকশী হাসিমুখে সিগারেট টানতে টানতে হাজির হল, সামনে-পিছে দেহরক্ষী। ইদানীং এসব ব্যাপারে সে খুব সাবধান। কামাল কালিঝুলি মেখে শেষবারের মতো সবকিছু দেখে নিচ্ছিল—হাকশীকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

সব ঠিক হয়েছে?

কামাল হাকশীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, আগে জেসমিনকে ছেড়ে দাও। তারপর—

হাকশী পকেট থেকে চাবি বের করে ছুঁড়ে দিল একজনকে—জেসমিনকে ঘর খুলে নিয়ে আসার জন্যে। মিনিটখানেকের ভেতরই জেসমিনকে নিয়ে সে ফিরে এল। এ কয় দিনে জেসমিন বেশ শুকিয়ে গেছে। রুক্ষ চুল, চোখের কোণে কালি। চেহারায় আতঙ্কের একটা ছাপ পাকাপাকিভাবে পড়ে গেছে।

হাকশী কামালকে বলল, বেশ, এবারে দেখাও।

কামাল এতটুকু না নড়ে বলল, তুমি আমাদের কি কথা দিয়েছিলে মনে আছে?

কি কথা?

প্লুটোনিক আর ফোবোসের রি-অ্যাক্টর দু'টি ঠিক করে দিলে আমাদের তিন জনকে ছেড়ে দেবে।

বলেছিলাম নাকি।

কামাল মুখ শক্ত করে বলল, হ্যাঁ, বলেছিলে।

বলে থাকলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব—তার আগে আমাকে দেখাও তোমরা রি-অ্যাক্টর দু'টি ঠিক করেছ।

দেখাচ্ছি। কিন্তু আমাদেরকে ছেড়ে দেবে তো?

সে দেখা যাবে—বলে হাকশী এগিয়ে গিয়ে কামালকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সুইচ প্যানেলের সামনে দাঁড়ায়। বিভিন্ন সুইচ অন্ করে সে রি-অ্যাক্টরটি চালু করার আয়োজন করে।

মিনিট তিনেকের ভেতরই রি-অ্যাক্টর চালু হয়ে ঘরে ঘরে তীব্র উজ্জ্বল আলো জ্বলে ওঠে, এয়ার কণ্ডিশনারের গুঞ্জন শোনা যায়, প্লুটোনিকে প্রাণ ফিরে আসে।

হাকশীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। সবকিছু পরীক্ষা করে সে ভারি খুশি হয়ে ওঠে। কামালের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, ভালোকাজ করেছ হে ছেলে! এবারে চল ফোবোসটি দেখে আসি।

দাঁড়াও।

জাহিদের গলার স্বর শুনে হাকশী থমকে দাঁড়াল। বলল, কি?

ফোবোসে কামালের সাথে আমি আর জেসমিনও যাব—তুমি ওটা চালু করে আমাদের পৃথিবীতে রেখে আসবে।

হাকশী এমন ভান করল, যেন কথাটি বুঝতে পারে নি।

আমার কথা বুঝেছ?

না। হাকশী ধূর্তের মতো হাসল। তোমাদের সত্যি সত্যি পৃথিবীতে রেখে আসব, এ ধারণা কেমন করে হল!

কামাল চমকে উঠে বলল, মানে?

মানে খুব সহজ। হাকশীর মুখ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। তোমাদের সাহস খুব বেড়ে গেছে—ভেবেছিলে আমাকে ভয় দেখিয়ে কাজ উদ্ধার করবে। হাকশী ভয় পেতে অভ্যস্ত নয়। যদি কেউ ভয় দেখাতে চায়—

স্কাউণ্ড্রেল! কামাল তীব্র স্বরে চিৎকার করে উঠল, বেঈমান, মিথ্যুক।

কামাল। হাকশী সরু চোখে ওর দিকে তাকাল, তোমার ঔদ্ধত্যের শাস্তি তুমি পাবে—আমি নিজের হাতে তোমায়—

হঠাৎ কামাল পাগলের মতো হেসে উঠল। বিকৃত মুখে হাসতে হাসতে বলল, হাকশী! নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভেবেছ? ভেবেছিলে আমরা তোমায় বিশ্বাস করেছি? আমরা—

জাহিদ হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে চিৎকার করে উঠল, কামাল!

কামাল জাহিদের দিকে তাকাল এবং তারপর চুপ করে গেল। শুধু ওর মুখ থেকে হাসিটি মুছে গেল না, বরং আরো বিস্তৃত হয়ে উঠতে লাগল।

কামাল কী বলতে চাইছিল হাকশী বুঝতে পারল না। এক পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী বলছিলে?

কিছু না।

হাকশীর চোখ ধক করে জ্বলে উঠল। তুমি বলছিলে তোমরা আমায় বিশ্বাস কর নি। তার মানে নিশ্চয় কিছু-একটা করেছ। বল কি করেছ?

বলব না।

তার মানে কিছু-একটা করেছ?

না।

হাকশীর চেহারা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ছোট হয়ে যাওয়া সিগারেটটাকে হাতে নিয়ে সে জেসমিনের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর জেসমিনের চুল মুঠি করে ধরে নিজের কাছে নিয়ে আসে—কিছু বোঝার আগেই সে তার গালে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরে—

জেসমিন আর্তচিৎকার করে উঠল—কামাল ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল, কিন্তু তার আগেই তাকে দু'দিক থেকে ধরে ফেলল হাকশীর দেহরক্ষীরা।

বন্ধ কর্—বন্ধ কর্ হারামজাদা—আমি বলছি!

হাকশী সিগারেটটা সরিয়ে নেয়—কামাল অপ্রকৃতিস্থের মতো বলল, শুধু তুই শুনবি! অন্যদেরও ডাক্-

আমি শুনলেই চলবে। তুমি বল।

কামাল জাহিদের দিকে তাকাল, বলল, জাহিদ, বলেই দিই। কোনো ক্ষতি হবে না, সময় তো নেইও—কিছু করতে চাইলেও করতে পারবে না।

জাহিদ চিন্তিত মুখে বলল, বলতে তো হবেই। নইলে বেচারি জেসমিন শুধু শুধু কষ্ট পাবে। ঠিক আছে, আমি বলছি।

জাহিদ হাকশীর দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর কীভাবে কাজ করে নিশ্চয়ই তুমি জান। চেইন রিঅ্যাকশান কন্ট্রোল করার জন্যে ক্যাডমিয়াম রড থাকে। কেউ যদি ক্যাডমিয়াম রড কেটে ছোট করে দেয় তাহলে কি হবে, জান নিশ্চয়ই। চেইন রি-অ্যাকশান শুরু হবে ঠিকই, কিন্তু কন্ট্রোল করা যাবে না। যে চেইন রি-অ্যাকশান কন্ট্রোল করা যায় না, তাকে বলে অ্যাটম বোমা।

কি বলতে চাইছ তুমি—তোমরা রি-অ্যাক্টরে—

হ্যাঁ, আমরা প্লুটোনিকের রি-অ্যাক্টরের ক্যাডমিয়াম রড কেটে ছোট করে দিয়েছি। কাজেই এই রি-অ্যাক্টরটা আসলে একটা অ্যাটম বোমা হয়ে গেছে। অনেক কষ্ট করে হিসেব করে বের করতে হয়েছে, ঠিক কতটুকু কেটে নিলে দশ মিনিট পরে বিস্ফোরণটি ঘটে। বন্ধ করার উপায় নেই—তার আগেই দশ মিনিট পার হয়ে যাবে—

দশ মিনিট? হাকশী ঘড়ির দিকে তাকাল—তারপর জাহিদের দিকে তাকাল তীব্র চোখে, সান অব বিচ! ব্লক হেডেড্ ফুল—

কেন মিছিমিছি গালিগালাজ করছ! এখন সবাই মিলে মারা যাব, মাথা-গরম করে লাভ কি! অনেক লোক মেরেছ তুমি হাকশী—পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তুমি অনেক মহাকাশযান ধ্বংস করেছ—এখন দেখ, মরতে কেমন লাগে! আর দুই-এক মিনিট, তারপর তুমি তোমার দলবল নিয়ে চলে যাবে নরকে আর আমরা স্বর্গে!

হঠাৎ হাকশী ধরে রাখা জেসমিনকে ছেড়ে দিয়ে দু'পা এগিয়ে গেল, তারপর চিৎকার করে দেহরক্ষীদের বলল, আমার যারা লোকজন রয়েছে তাদের খবর দিয়ে দশ সেকেণ্ডের ভেতর ফোবোসে চলে আস—আমরা ফোবোসে করে এক্ষুণি প্লুটোনিক ছেড়ে চলে যাব।

কামাল হিংস্রভাবে বলল, না—তুই কিছুতেই ফোবোস চালু করতে পারবি না—ওটা চালু হতে অন্তত পাঁচ মিনিট সময় নেয়—

হাকশী কামালের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কিছুই জান না ছোকরা। ফোবোস পাঁচ সেকেণ্ডে চালু করা যায়। তোমরা মর—নিজেদের তৈরি অ্যাটম বোমায় নিজেরা মরে শেষ হয়ে যাও! আমি বেঁচে থাকতে জন্মেছি—শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকব।

সে দ্রুত ছুটে গেল সিঁড়ি বেয়ে ফোবোসের দিকে।

জাহিদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—জেসমিন মুখ ঢেকে বসে পড়ল সেখানে।

তিরিশ সেকেণ্ডের ভেতর হাকশী তার নিজের লোকজন নিয়ে ফোবোসে করে পালিয়ে গেল। প্লুটোনিকে রয়ে গেল শুধুমাত্র বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে আনা নির্দোষ নিরীহ বিজ্ঞানী আর টেকনিশিয়ানরা। প্লুটোনিক আর এক মিনিটের ভেতর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে খবর পেয়ে অধিকাংশ লোকই পাগলের মতো হয়ে গেছে। হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো দাপাদাপি করছে অনেকে—। অল্প কয়জন হাঁটু গেড়ে শেষবারের মতো প্রার্থনা করছে—চোখ দিয়ে পানি বের হচ্ছে টপটপ করে।

দেয়ালে টাঙানো মস্ত স্ক্রীনটা হঠাৎ আলোকিত হয়ে সেখানে হাকশীর চেহারাটা ফুটে উঠল। ফোবোস থেকে সে প্লুটোনিকের সাথে যোগাযোগ করেছে।

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তোমাদের কেমন দেখায় তাই দেখতে চাইছি।

দেখ—জাহিদ হাকশীর দিকে তাকিয়ে হাসল। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে আমি কেমন হাসতে পারি, দেখেছ?

তাই দেখছি। দুঃখ থেকে গেল তোমাদের দু'জনকে নিজের হাতে শেষ করতে পারলাম না। তা হলে দেখতাম কিভাবে হাসি বের হয়!

আমারও একই দুঃখ—তোমায় নিজহাতে মারতে পারলাম না।

হাকশী হো-হো করে হেসে উঠল—নিজহাতে বা পরের হাতে কোনোভাবেই হাকশীকে কেউ মারতে পারবে না—

এক সেকেণ্ড হাকশী। একটা খুব জরুরি কথা মনে হয়েছে—

কি?

তোমায় বলেছিলাম না, প্লুটোনিকের নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টরের ক্যাডমিয়াম রড কেটে ওটাকে অ্যাটম বোমা বানিয়ে দিয়েছি? আসলে একটা ছোট ভুল হয়ে গেছে। ফোবোস বলতে আমি ভুলে প্লুটোনিক বলে ফেলেছিলাম।

হাকশী ভয়ংকর মুখে বলল, মানে?

মানে প্লুটোনিকের রি-অ্যাক্টর ঠিকই আছে! ফোবোসের রি-অ্যাক্টর আসলে অ্যাটম বোমা হয়ে গেছে। তুমি তোমার দলবল নিয়ে অ্যাটম বোমার উপর বসে আছ! এক্ষুণি ফাটবে ওটা—দশ পর্যন্ত গোনার আগে!

প্রচণ্ড ক্রোধ, দুঃখ, হতাশা আর আতঙ্কে হাকশীর মুখ ভয়াবহ হয়ে উঠল। কী যেন বলতে চাইল—গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না। আবার কী যেন বলতে চাইল—তারপর বিকৃত মুখে হাঁটু ভেঙে সে ফোবোসের ভিতরে পড়ে গেল—

টেলিভিশনের পর্দা হঠাৎ করে কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল। ঝুলিয়ে রাখা কাউন্টারগুলি কঁ-কঁ শব্দ করে বুঝিয়ে দিল, কাছাকাছি কোথাও একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে।

জাহিদ একটা নিঃশ্বাস ফেলে কামালের দিকে তাকাল। তারপর দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসল।

বেঁচে গেলাম তা হলে!

আমরা বেঁচে গেলাম, পৃথিবীও বেঁচে গেল।

যাই বলিস না কেন, অভিনয়টা দারুণ হয়েছিল। বিশেষ করে ঐ পাগলের মতো হেসে উঠে তুই যখন বললি—

থাক, আর বলতে হবে না! তুই নিজেও কিছু কম করিস নি!

দু'জনে হো-হো করে হেসে উঠে জেসমিনের কাছে এগিয়ে যায়। প্লুটোনিকের সবাই তখন ওদের কাছে ছুটে আসছে—প্লুটোনিক কীভাবে রক্ষা পেল এবং হাকশী কীভাবে ধ্বংস হল জানার জন্যে।

কামাল আর জেসমিনকে সবার অভিনন্দন নেয়ার দায়িত্ব দিয়ে জাহিদ হাকশীর নিজের ঘরে চলে এসেছে। এখানে পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে, যেটা এতদিন শুধুমাত্র হাকশী নিজে ব্যবহার করতে পারত।

সুইচ অন করে জাহিদ চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকে। পৃথিবী থেকে প্রায় দু' কোটি মাইল দূরে, কাজেই মিনিট চারেক সময় লাগবে। বাইরে আনন্দ স্ফূর্তির ঢেউ বইছে। বন্ধ ঘরেও মাঝে মাঝে চিৎকারের শব্দ চলে আসছিল। জাহিদ আপন মনে হাসে—কিছুক্ষণের মাঝে কামালের মতো একটা কাঠগোঁয়ার লোক পপুলার হিরো হয়ে গেছে।

স্ক্রীনে আবছা পৃথিবীটা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হতে থাকে। জাহিদ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—পৃথিবী। তার সাধের পৃথিবী। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কী-এক অজানা আবেগে ওর বুকের ভেতর যন্ত্রণা হতে থাকে, চোখে পানি জমে আসে।

ঘরে কেউ নেই, তবু জাহিদ এদিক-সেদিক তাকিয়ে চোখের পানি মুছে ফেলল। তারপর মাইক্রোফোনটা টেনে নিল নিজের দিকে।

পরিশিষ্ট

১। নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর : পারমাণবিক শক্তিকে ব্যবহার করার জন্যে যেখানে নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটানো হয়।

২। রাডার : বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের সাহায্যে দূরবর্তী কোনো বস্তুকে খুঁজে বের করার পদ্ধতি।

৩। ফ্লাইং সসার : অন্য কোনো গ্রহ থেকে আসা বিশেষ ধরনের মহাকাশযান সম্পর্কিত আলোচিত গুজব। পিরিচের মতো আকৃতি বলে নাম ফ্লাইং সসার।

৪। লেসার : প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী আলোকরশ্মি।

৫। আইসোটোপ : একই পরমাণুর বিভিন্ন নিউক্লিয়াস, যেখানে প্রোটনের সংখ্যা সমান, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন।

৬। ক্রিটিক্যাল মাস : বিশেষ ধরনের নিউক্লিয়াস; যে-নির্দিষ্ট স্তরে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।

৭। ভাইরাস : নিচুস্তরের অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায় জীব। অনেক ভয়াবহ রোগ বিভিন্ন ভাইরাসের কারণে ঘটে থাকে।

৮। চেইন রি-অ্যাকশান : একটি নিউক্লিয়াস ভাঙা থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক নিউক্লিয়াস ভেঙে পারমাণবিক শক্তি পাওয়ার নিরবচ্ছিন্ন পদ্ধতি।